পরিব্রাজক

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশক ঃ
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা — ৭০০ ০০৩

একাদশ সংস্করণ
১৯৬৩

মুদ্রক ঃ
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৩০

পরিচয়

হে পাঠক! প্রাচীন পরিব্রাজক আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান। তোমারও কুলগত আতিথ্য চিরপ্রথিত। অতিথি যতিকে পূর্বের ন্যায় সম্মানপূর্বক আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে স্থান দিবে কি? এবার কেবল ভারতভ্রমণ নহে, পৃথিবীর নানাস্থান পর্যটনের অভিজ্ঞতাদানে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সে-সকল কথা শুনিলে বুঝিবে, তাঁহার ভ্রমণ উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কিসে ভারতে বর্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে---এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপের মূলে। আবার ভারতের দুর্দশা কোথা হইতে আসিল, কোন্ শক্তিবলে উহা অপগত হইবে, কোথায়ই বা সে সুপ্তশক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং উহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি—এ-সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাঁহাকে ক্ষান্ত দেখিবে, তাহা নহে, কিন্তু বদ্ধপরিকর যতি স্বদেশে-বিদেশে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মীমাংসিত বিষয়সকলের সত্যতাও যথাসম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহার নিদর্শনও প্রাপ্ত হইবে। বুদ্ধিমান বিদেশী তাঁহার উপদেশ কার্যে পরিণত করিয়া বলপুষ্ট হইতে চলিল; হে স্বদেশী! তুমিও কি এইবার তোমারই জন্য বহুশ্রমে সমাহৃত সারগর্ভ সত্যগুলি হৃদয়ে ধারণ এবং কার্যে পরিণত করিয়া সফলকাম হইবে?

ইতি—

বিনীত

সারদানন্দ

১ মাঘ, ১৩১২

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন হইতে

পরিব্রাজকের কাগজ-পত্র অনুসন্ধানের ফলে আমরা তাঁহার অস্ট্রিয়া হইতে তুর্কি হইয়া ইজিপ্ট প্রত্যাগমনাবধি ভ্রমণ-কাহিনী কতক সবিস্তারে এবং কতক 'ডায়েরি'র আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে সার্ভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের সবিস্তার বর্ণিতাংশটি বর্তমান সংস্করণে পুস্তকমধ্যে সন্নিবেশিত এবং 'ডায়েরি'র নোটগুলি পরিশিষ্টের মধ্যে মুদ্রিত করা হইল।...ইতি—

বশংবদ

প্রকাশক

১৩১৮

ত্রয়োদশ সংস্করণের নিবেদন

এই সংস্করণে "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা" অনুসরণ করা হইয়াছে। 'তথ্যপঞ্জী'ও সংযোজিত হইল।

ফাল্গুন, ১৩৮৪ **প্রকাশক**

সূচীপত্র

পরিব্রাজক

[১৮৯৯ খ্রীঃ ২০ জুন স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতা হইতে গোলকোণ্ডা জাহাজে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে স্বামীজী নিয়মিতভাবে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠাইতে সম্মত হন। পত্রাকারে লিখিত সেই নানা অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ভ্রমণকাহিনীই উদ্বোধনের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় 'বিলাতযাত্রীর পত্র'রূপে প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পরে স্বামী সারদানন্দের তত্ত্বাবধানে 'পরিব্রাজক'রূপে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এই লেখায় 'তু-ভায়া' স্বামী তুরীয়ানন্দকে বুঝাইতেছে। 'স্বামীজী' বলিয়া এখানে পত্রে বিবেকানন্দ সম্বোধন করিয়াছেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে।]

পরিব্রাজক

ভূমিকা

স্বামীজি! ওঁ নমো নারায়ণায়—'মো'কারটা হৃষিকেশী ঢঙের উদাত্ত করে নিও ভায়া। আজ সাতদিন হল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে, খবরটা লিখবো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু—ঐ বাঙালী 'কিন্তু' বড়ই গোল বাঁধায়। একের নম্বর—কুঁড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বলো, রোজ লিখবো, মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা অনন্ত 'কাল' নামক সময়েতেই থাকে; এক পা-ও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে করো যে, মহাবীরের মতো বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না—রাম হৃদয়ে বলে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুঁড়েমি। কি উৎপাত! 'ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ'—থুড়ি, হল না, 'ক্ব সূর্যপ্রভববংশচূড়ামণিরামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ' আর কোথা আমি দীন—অতি দীন। তবে তিনিও শত যোজন সমুদ্র পার এক লাফে হয়েছিলেন, আর আমরা কাঠের বাড়ির মধ্যে বন্ধ হয়ে, ওছল পাছল করে, খোঁটা-খুঁটি ধরে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস-রাক্ষুসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস-রাক্ষুসীদের দলের সঙ্গে যাচ্চি! খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাচ করে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা। বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের 'সী সিক্‌নেস্'[১] হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো-পণ্ডিত মানুষ,

১ Sea sickness—জাহাজের দুলুনিতে মাথাঘোরা এবং বমনাদি হওয়া

বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের 'গোঁসাইজী' তো কিছুই বলছেন না। বোধ হয়—হয়নি; তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেইখানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু-ভায়া বলছেন, জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্ করে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস্ করে পাতালমুখো হয়ে বলি রাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ হয় যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছেন। মাফ ফরমাইয়ো ভাই—ভালো লোককে কাজের ভার দিয়েছ। রাম কহো! কোথায় তোমায় সাতদিন সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙ ঢঙ মসলা বার্ণিশ থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবল-তাবল বকছি! ফল কথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ্ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বলো। 'কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাশান গুজরাত,'[১] আজন্ম ঘুরছি। কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চির-নীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম ঘড়ঘড়ায়িত, ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত দ্যালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে—আঁব-কাঠের তক্তায় বসে, থেলো হুঁকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতির যে—হুবহু ছবিগুলি— চিত্রিত করে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। শ্যামাচরণ ছেলেবেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেথায় আকণ্ঠ আহার করে একঘটি জল খেলেই বস্—সব হজম, আবার খিদে, সেখানে শ্যামাচরণের প্রাতিভদৃষ্টি এই সকল প্রাকৃতিক বিরাট ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেছে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম—বর্ধমান পর্যন্ত নাকি শুনতে পাই।

তবে একান্তই তোমাদের উপরোধ, আর আমিও যে একেবারে 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস' নহি, সেটা প্রমাণ করবার জন্য শ্রীদুর্গা স্মরণ করে আরম্ভ করি; তোমরাও খোঁটাখুটি ছেড়ে দিয়ে শোনোঃ

নদীমুখ বা বন্দর হতে জাহাজ রাত্রে প্রায় ছাড়ে না—বিশেষ কলকাতার

১ তুলসীদাসের দোঁহার মধ্যে এই বাক্যটি আছে

ন্যায় বাণিজ্যবহুল বন্দর, আর গঙ্গাব ন্যায় নদী। যতক্ষণ না জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছায়, ততক্ষণই আড়কাটীর[১] অধিকার; তিনিই কাপ্তেন, তাঁরই হুকুম; সমুদ্রে বা আসবাব সময় নদীমুখ হতে বন্দর পৌঁছে দিয়ে তিনি খালাস। আমাদের গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয়ঃ একটি বজবজেব কাছে জেম্‌স ও মেরী নামক চোরা বালি, দ্বিতীয়টি ডায়মণ্ডহারবারের মুখে চড়া। পুরো জোয়ারে, দিনের বেলায় পাইলট অতি সন্তর্পণে জাহাজ চালান, নতুবা নয়। কাজেই গঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দুদিন লাগলো।

১ আড়কাটী—যিনি বন্দব হইতে সমুদ্র পর্যন্ত জলেব গভীবতাদি জানেন এবং বন্দরেব নিকটে জাহাজ চালাইবাব ভার লন, pilot

গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশহাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি' আর সেই অদ্ভুত 'হর হর হর' তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের 'হর হর' প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল- প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্যন্ত দেখেছ; কিন্তু আমাদের কর্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্র- পোতবক্ষা এ কলকাতার গঙ্গায় কি টান আছে তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ!—কুসংস্কার কি?—হবে! গঙ্গা গঙ্গা করে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর দূরান্তরে লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন করে রাখে, পালপার্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় করে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মালটা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি। বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত! সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম—সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই 'হর হর হর', দেখতাম—সেই হিমালয়- ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী

সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—'হর হর হর'।

এবার তোমরাও পাঠিয়েছ দেখছি মাকে মাদ্রাজের জন্য। কিন্তু একটা কি অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মাকে প্রবেশ করিয়েছ ভায়া। তু-ভায়া বালব্রহ্মচারী 'জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা'; ছিলেন 'নমো ব্রহ্মণে', হয়েছেন, 'নমো নারায়ণায়' (বাপ, রক্ষা আছে!), তাই বুঝি ভায়ার হস্তে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ছেড়ে মায়ের বদ্‌নায় প্রবেশ। যা হোক, খানিক রাত্রে উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদ্‌নাকার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেটা ভেদ করে মা বেরুবার চেষ্টা করছেন। ভাবলুম সর্বনাশ, এইখানেই যদি হিমাচল-ভেদ, ঐরাবত-ভাসান, জহ্নুর কুটির ভাঙা প্রভৃতি পর্বাভিনয় হয় তো—গেছি। স্তবস্তুতি অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম— মা! একটু থাক, কাল মাদ্রাজে নেমে যা করবার হয় করো, সে দেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটির, আর ঐ যে চকচকে কামানো টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারি, হিমাচল তো ওর কাছে মাখম, যত পার ভেঙো, এখন একটু অপেক্ষা কর। উঁহু; মা কি শোনে! তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, বললুম—মা দেখ, ঐ যে পাগড়ি মাথায় জামাগায়ে চাকরগুলি জাহাজে এদিক ওদিক করছে, ওরা হচ্ছে নেড়ে—আসল গরুখেকো নেড়ে, আর ঐ যারা ঘরদোর সাফ করে ফিরছে, ওরা হচ্চে আসল মেথর, লালবেগের[১] চেলা। যদি কথা না শোনো তো ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইছি আর কি! তাতেও যদি না শান্ত হও, তোমায় এক্ষুণি বাপের বাড়ি পাঠাব; ঐ যে ঘরটি দেখছ, ওর মধ্যে বন্ধ করে দিলেই তুমি বাপের বাড়ির দশা পাবে, আর তোমার ডাক হাঁক সব যাবে, জমে একখানি পাথর হয়ে থাকতে হবে। তখন বেটী শান্ত হয়। বলি, শুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশা—ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চড়ে বসেন।

১ ঐতিহাসিক ইলিয়টের মতে লালবেগীদেব (ঝাড়ুদার মেথর সম্প্রদায়বিশেষ) উপাস্য আদিপুরুষ বা কুলদেবতা লালবেগ ও উত্তরপশ্চিমের লালগুরু (রাক্ষস অবণ্য কিরাত) অভিন্ন। বারাণসীবাসী লালবেগীদের মতে পীর জহুরই (চিস্তিয়া সাধু সৈয়দ সাহ জুহুর) লালবেগ

কি বর্ণনা করতে কি বকছি আবার দেখ! আগেই তো বলে রেখেছি, আমার পক্ষে ওসব এক রকম অসম্ভব, তবে যদি সহ্য কর তো আবার চেষ্টা করতে পারি।

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশস্য-শ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময় মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার—বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল-নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নিচে ঝোপ-ঝোপ তাল- নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার নিচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কাল মেশানো—ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁঠাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নিচে—যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানি তুর্কিস্তানি গালচে -দুলচে কোথায় হার মেনে যায়! সেই ঘাস, যতদূর চাও—সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, সে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নিচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নিচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা! একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে

পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। (দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে।) ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইট-খোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধা-বোট; আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নিচুর রং, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আব দেখতে পাবে? দেখবে— পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি !!!

বঙ্গোপসাগরে

এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়ল। ঐ যে 'দূরাদয়শ্চক্র' ফক্র 'তমালতালী-বনরাজি'[১] ইত্যাদি ওসব কিছু কাজের কথা নয়। মহাকবিকে নমস্কার করি, কিন্তু তিনি বাপের জন্মে হিমালয়ও দেখেননি, সমুদ্রও দেখেননি, এই আমার ধারণা।[২]

এইখানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন সর্বত্র দুর্লভ হলেও 'গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে'। তবে এ জায়গা বলে ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আমি নমস্কার করি, 'সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং' বলে।

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ'।[৩] সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহা গর্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির

---

১ দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।।—রঘুবংশ

২ কাশ্মীর ভ্রমণ এবং ঐ দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া পবে স্বামীজীর এই বিষয়ে মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস অনেক দিন পর্যন্ত কাশ্মীর দেশের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—এ-কথা ঐ দেশের ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়। রঘুবংশাদি-বিবৃত হিমালয়-বর্ণনা কাশ্মীর খণ্ডের হিমালয়েব দৃশ্যের সহিত অনেক স্থলে মিলে। কিন্তু কালিদাস কখন সমুদ্র দেখিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ আমরা এ পর্যন্ত পাই নাই।

৩ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য কৃত 'শিবাপরাধভঞ্জনস্তোত্র'

উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে! তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা-ধরাপতি, সেই জাতির নরনারী—বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্তিমান আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান—সগর্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ-ঝম্ফ গুরুগর্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল- উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি; সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার-সম্মিলিত 'রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্' মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল! চমকিয়া চাহিয়া দেখি—

জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুটি বাঙালী ছেলে—পড়তে যাচ্চে। তাদের অবস্থা ভায়ার চেয়েও খারাপ। একটি তো এমনি ভয় পেয়েছে যে, বোধ হয় তীরে নামতে পারলে একছুটে চোঁচা দেশের দিকে দৌড়য়। যাত্রীদের মধ্যে তারা দুটি আর আমরা দুজন ভারতবাসী—আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি। যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু-ভায়া 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক করে তুলতেন। আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?' ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, 'বড়ই শোচনীয়—বেজায় গুলিয়ে যাচ্চে!'

এতবড় পদ্মা ছেড়ে গঙ্গার মাহাত্ম্য হুগলি নামক ধারায় কেন বর্তমান, তার কারণ অনেকে বলেন যে, ভাগীরথী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জলধারা। পরে গঙ্গা পদ্মা-মুখ করে বেরিয়ে গেছেন। ঐ প্রকার 'টলিজ নালা' নামক খালও আদি গঙ্গা হয়ে গঙ্গার প্রাচীন স্রোত ছিল। কবিকঙ্কণ পোতবণিক-নায়ককে ঐ পথেই সিংহল দ্বীপে নিয়ে গেছেন। পূর্বে ত্রিবেণী পর্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ করত। সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীন বন্দর এই ত্রিবেণী ঘাটের কিঞ্চিৎ দূরেই সরস্বতীর উপর ছিল। অতি প্রাচীনকাল হতেই এই সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। ক্রমে সরস্বতীর

মুখ বন্ধ হতে লাগলো। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মুখ এত বুজে এসেছে যে, পোর্তুগিজেরা আপনাদের জাহাজ আসবার জন্যে কতকদূর নিচে গিয়ে গঙ্গার উপর স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলি-নগর। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই স্বদেশী বিদেশী সওদাগরেরা গঙ্গায় চড়া পড়বার ভয়ে ব্যাকুল; কিন্তু হলে কি হবে; মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি আজও বড় একটা কিছু করে উঠতে পারেনি। মা গঙ্গা ক্রমশই বুজে আসছেন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদ্রী লিখেছেন, সূতির কাছে ভাগীরথী-মুখ সে সময়ে বুজে গিয়েছিল। অন্ধকূপের হলওয়েল—মুর্শিদাবাদ যাবার রাস্তায় শান্তিপুরে জল ছিল না বলে, ছোট নৌকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেব লিখছেন যে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর জলাঙ্গী[১] নদীতে নৌকা চলে না। ১৮২২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে নৌকার গমাগম বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে ২৪ বৎসর দুই বা তিন ফিট জল ছিল। ১৭ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা হুগলির ১ মাইল নিচে চুঁচড়ায় বাণিজ্যস্থান করলে; ফরাসীরা আরও পরে এসে তার আরও নিচে চন্দননগর স্থাপন করলে। জার্মান অস্টেণ্ড কোম্পানি ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের পাঁচ মাইল নিচে অপর পারে বাঁকীপুর নামক জায়গায় আড়ত খুললে। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমারেরা চন্দননগর হতে আট মাইল দূরে শ্রীরামপুরে আডত করলে। তারপর ইংরেজরা কলকেতা বসালেন আরও নিচে। পূর্বোক্ত সমস্ত জায়গায়ই আর জাহাজ যেতে পারে না। কলকেতা এখনও খোলা, তবে 'পরেই বা কি হয়' এই ভাবনা সকলের।

তবে শান্তিপুরের কাছাকাছি পর্যন্ত গঙ্গায় যে গরমিকালেও এত জল থাকে তার এক বিচিত্র কারণ আছে। উপরের ধারা বন্ধপ্রায় হলেও রাশীকৃত জল মাটির মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। গঙ্গার খাদ এখনও পারের জমি হতে অনেক নিচু। যদি ঐ খাদ ক্রমে মাটি বসে উঁচু হয়ে উঠে, তাহলেই মুশকিল। আর এক ভয়ের কিংবদন্তি আছে; কলকেতার কাছেও মা গঙ্গা ভূমিকম্পে বা অন্য কারণে মধ্যে মধ্যে এমন শুকিয়ে গেছেন যে, মানুষে হেঁটে পার হয়েছে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে নাকি ঐ

১ জলাঙ্গী নদী নবদ্বীপ হইতে কিছু দূরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমের পর হইতেই ভাগীরথীর নাম হুগলি হইয়াছে

বকম হয়েছিল। আর এক রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বারবেলায় এইটে ঘটলে কি হত, তোমরাই বিচার কর—গঙ্গা বোধ হয আব ফিরতেন না।

এই তো গেল উপবেব কথা। নিচে মহাভয—'জেম্‌স আর মেরী' চড়া। পূর্বে দামোদব নদ কলকেতাব ৩০ মাইল উপবে গঙ্গায এসে পড়ত, এখন কালের বিচিত্র গতিতে তিনি ৩১ মাইলেব উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায় ৬ মাইল নিচে রূপনারায়ণ জল ঢালছেন, মণিকাঞ্চনযোগে তাঁরা তো হুড়মুড়িযে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই রাশীকৃত বালি। সে স্তূপ কখন এখানে, কখন ওখানে, কখন ঐকটু শক্ত, কখন বা নবম হচ্চেন। সে ভয়েব সীমা কি! দিন বাত তার মাপজোখ হচ্ছে, একটু অন্যমনস্ক হলেই—দিনকতক মাপজোখ ভুললেই জাহাজের সর্বনাশ। সে চড়ায় ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি উলটে ফেলা না হয় সোজাসুজিই গ্রাস!! এমনও হযেছে, মস্ত তিন-মাস্তুল জাহাজ লাগবাব আধ ঘণ্টা বাদেই খালি একটু মাস্তুলমাত্র জেগে বইলেন। এ চড়া দামোদর-রূপনারায়ণের মুখই বটেন। দামোদর এখন সাঁওতালি গাঁয়ে তত রাজি নন, জাহাজ স্টীমার প্রভৃতি চাটনি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকেতা থেকে 'কাউন্টি অফ স্টাবলিং' নামক এক জাহাজে ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যে 'খোঁজ খবর নাহি পাই'। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪০০ টন বোঝাই একটি স্টীমারের দু-মিনিটেব মধ্যে ঐ দশা হয। ধন্য মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিযে এসেছি, প্রণাম করি।

তু-ভায়া বললেন, 'মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে'; আমিও বলি, 'তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।' পরদিন তু-ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, তার কি হল?' সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চলছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ও তো আপনি খাচ্চেন'। তখন অনেক যত্ন করে বোঝাতে হল যে—কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুববাড়ি যায়; সেখানে খাবার সময় চারিদিকে

ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও।' জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া—অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললে, 'বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।' অতএব হে ভাই! আমি কলকেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভায়া যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল—বোঝা গেল না।

জাহাজের কথা

এ জাহাজ কি আশ্চর্য ব্যাপাব! যে সমুদ্র— ডাঙা থেকে চাইলে ভয হয়, যাঁর মাঝখানে আকাশটা নুয়ে এসে মিলে গেছে বোধ হয়, যাঁর গর্ভ হতে সূর্যমামা ধীরে ধীরে উঠেন আবার ডুবে যান, যাঁর একটু ভ্রূভঙ্গে প্রাণ থরহরি, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন রাজপথ, সকলের চেয়ে সস্তা পথ! এ জাহাজ করলে কে? কেউ করেনি; অর্থাৎ মানুষের প্রধান সহায়স্বরূপ যে সকল কলকব্জা আছে, যা নইলে একদণ্ড চলে না, যার ওলটপালটে আর সব কলকারখানার সৃষ্টি, তাদের ন্যায—সকলে মিলে করেছে। যেমন চাকা; চাকা নইলে কি কোন কাজ চলে? হ্যাকচ হোঁকচ গরুর গাড়ি থেকে 'জয় জগন্নাথে'র রথ পর্যন্ত, সুতো-কাটা চরকা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার কল পর্যন্ত কিছু চলে? এ চাকা প্রথম করলে কে? কেউ করেনি, অর্থাৎ সকলে মিলে করেছে। প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিযে কাঠ কাটছে, বড় বড় গুঁড়ি ঢালু জায়গায গড়িয়ে আনছে, ক্রমে তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরি হল, ক্রমে অরা নাভি ইত্যাদি ইত্যাদি—আমাদের চাকা। কত লাখ বৎসর লেগেছিল কে জানে? তবে এ ভারতবর্ষে যা হয়, তা থেকে যায়। তার যত উন্নতি হোক না কেন, যত পরিবর্তন হোক না কেন, নিচের ধাপগুলিতে ওঠবার লোক কোথা না কোথা থেকে এসে জোটে, আর সব ধাপগুলি রয়ে যায়। একটা বাঁশের গায়ে একটা তার বেঁধে বাজনা হল; তার ক্রমে একটা বালাঞ্চির ছড়ি দিয়ে প্রথম বেহালা হল, ক্রমে কত রূপ বদল হল, কত তার হল, তাঁত হল, ছড়ির নাম রূপ বদলালো, এসরাজ সারঙ্গি হলেন। কিন্তু এখনও কি গাড়োয়ান মিঞারা ঘোড়াব গাছকতক বালাঞ্চি নিয়ে একটা ভাঁড়ের মধ্যে বাঁশের চোঙ বসিয়ে ক্যাঁকো করে, 'মজওয়ার কাহারে'র জাল বুনবার বৃত্তান্ত[১] জাহির করে না? মধ্যপ্রদেশে দেখগে, এখনও নিরেট চাকা গড়গড়িয়ে যাচ্ছে!

১ মজওযাব কাহাবওযা জাল বিনুরে।
দিনকো মাবে মছলি, রাতকো বিনু জাল।
এযসা দিকদাবি কিয়া জিউকা জঞ্জাল।
—ইত্যাদি গানটি গাড়োয়ানরা তখন প্রাযই গাহিত।

তবে সেটা নিরেট বুদ্ধির পরিচয় ঘটে, বিশেষ এ রবার-টায়ারের দিনে।

অনেক পুরাণকালের মানুষ, অর্থাৎ সত্যযুগের যখন আপামর সাধারণ এমনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পাছে ভেতরে একখান ও বাহিরে আর একখান হয় বলে কাপড় পর্যন্ত পরতেন না। পাছে স্বার্থপরতা আসে বলে বিবাহ করতেন না; এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হয়ে কোঁৎকা লোড়ালুড়ির সহায়ে সর্বদাই 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' বোধ করতেন; তখন জলে বিচরণ করবার জন্য তাঁরা গাছের মাঝখানটা পুড়িয়ে ফেলে অথবা দু-চারখানা গুঁড়ি একত্রে বেঁধে সালতি ভেলা ইত্যাদির সৃষ্টি করেন। উড়িষ্যা হতে কলম্বো পর্যন্ত কট্টুমারণ (Catamaran) দেখেছ তো? ভেলা কেমন সমুদ্রেও দূর দূর পর্যন্ত চলে যায় দেখেছ তো? উনিই হলেন—'ঊর্ধ্বমূলম্'।

আব ঐ যে বাঙাল মাঝির নৌকা—যাতে চড়ে দরিয়ার পাঁচ পীরকে ডাকতে হয়; ঐ যে চাটগেঁয়ে-মাঝি-অধিষ্ঠিত বজরা—যা একটু হাওয়া উঠলেই হালে পানি পায় না এবং যাত্রীদের আপন আপন 'দ্যাব্‌তার' নাম নিতে বলে; ঐ যে পশ্চিমে ভড়—যার গায়ে নানা চিত্রবিচিত্র-আঁকা পেতলের চোক দেওয়া, দাঁড়িরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে, ঐ যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা (কবিকঙ্কণের মতে শ্রীমন্ত দাঁড়ের জোরেই বঙ্গোপসাগর পার হয়েছিলেন এবং গলদা চিংড়ির গোঁপের মধ্যে পড়ে, কিস্তি বানচাল হয়ে ডুবে যাবার যোগাড় হয়েছিলেন; তথাপি কড়ি দেখে পুঁটিমাছ ঠাউরেছিলেন ইত্যাদি) ওরফে গঙ্গাসাগুরে ডিঙি—উপরে সুন্দর ছাওয়া, নিচে বাঁশের পাটাতন, ভেতবে সারি সারি গঙ্গাজলের জালা (যাতে 'মেতুয়া গঙ্গাসাগর'—থুড়ি, তোমরা গঙ্গাসাগর যাও আর কনকনে উত্তরে হাওয়ার গুঁতোয় 'ডাব নারিকেল চিনির পানা' খাও না); ঐ যে পানসি নৌকা, বাবুদের আপিস নিযে যায় আর বাড়ি আনে, বালির মাঝি যার নায়ক, বড় মজবুত, ভারি ওস্তাদ—কোন্নগুরে মেঘ দেখেছে কি কিস্তি সামলাচ্চে, এক্ষণে যা জওয়ানপুরিয়া জওয়ানের দখলে চলে যাচ্চে (যাদের বুলি— 'আইলা গাইলা বানে বানি', যাদেব ওপর তোমাদের মোহন্ত মহারাজের 'বঘাসুর' ধরে আনতে হুকুম হয়েছিল, যারা ভেবেই আকুল—'এ স্বামিনাথ! এ বঘাসুর কঁহা মিলেব! ই ত হাম জানব না')। ঐ যে গাধাবোট —যিনি সোজাসুজি যেতে জানেনই না, ঐ যে হুড়ি, এক থেকে তিন মাস্তুল—লঙ্কা, মালদ্বীপ বা আরব

থেকে নারকেল, খেজুর, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি বোঝাই হয়ে আসে; আর কত বলব, ওরা সব হলেন—'অধঃশাখা প্রশাখা'।

পালভরে জাহাজ চালানো একটি আশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়া। হাওয়া যেদিকে যাক না কেন, জাহাজ আপনার গম্যস্থানে পৌঁছবেই পৌঁছবে। তবে হাওয়া বিপক্ষ হলে একটু দেরি। পালওয়ালা জাহাজ কেমন দেখতে সুন্দর, দূরে বোধ হয়, যেন বহুপক্ষবিশিষ্ট পক্ষিরাজ আকাশ থেকে নামছেন। পালের জাহাজ কিন্তু সোজা চলতে বড় পাবেন না; হাওযা একটু বিপক্ষ হলেই এঁকে বেঁকে চলতে হয়, তবে হাওয়া একেবারে বন্ধ হলেই মুশকিল—পাখা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। মহা-বিষুবরেখার নিকটবর্তী দেশসমূহে এখনও মাঝে মাঝে এইরূপ হয। এখন পাল-জাহাজেও কাঠ-কাঠরা কম, তিনিও লৌহনির্মিত। পাল-জাহাজের কাপ্তানি করা বা মাল্লাগিরি করা স্টীমার অপেক্ষা অনেক শক্ত, এবং পাল-জাহাজে অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কাপ্তান কখনও হয় না। প্রতি পদে হাওয়া চেনা, অনেক দূর থেকে সঙ্কট জাযগার জন্য হুঁসিয়ার হওযা, স্টীমার অপেক্ষা এ দুটি জিনিস পাল-জাহাজে অত্যাবশ্যক। স্টীমার অনেকটা হাতের মধ্যে, কল মুহূর্তমধ্যে বন্ধ করা যায়। সামনে পেছনে আশে পাশে যেমন ইচ্ছা অল্প সময়ের মধ্যে ফিবানো যায়। পাল-জাহাজ হাওয়াব হাতে। পাল খুলতে, বন্ধ করতে, হাল ফেরাতে হয়তো জাহাজ চড়ায় লেগে যেতে পারে, ডুবো পাহাড়ের উপর চড়ে যেতে পারে, অথবা অন্য জাহাজেব সহিত ধাক্কা লাগতে পারে। এখন আর যাত্রী বড় পাল-জাহাজে যায় না, কুলি ছাড়া। পাল-জাহাজ প্রায় মাল নিয়ে যায় তাও নুন প্রভৃতি খেলো মাল। ছোট ছোট পাল-জাহাজ, যেমন হুড়ি প্রভৃতি কিনারায় বাণিজ্য করে। সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে টানবার জন্য স্টীমার ভাড়া করে হাজার হাজার টাকা টেক্স দিয়ে পাল-জাহাজের পোষায় না। পাল-জাহাজ আফ্রিকা ঘুরে ছ-মাসে ইংলণ্ডে যায়। পাল- জাহাজের এই সকল বাধার জন্য তখনকার জল-যুদ্ধ সঙ্কটের ছিল। একটু হাওয়ার এদিক ওদিক, একটু সমুদ্র-স্রোতের এদিক ওদিকে হার জিত হয়ে যেত। আবার সে-সকল জাহাজ কাঠের ছিল। যুদ্ধের সময় ক্রমাগত আগুন লাগত, আর সে আগুন নিবুতে হত। সে জাহাজের গঠনও আর এক রকমের ছিল। একদিক ছিল চেপটা আর অনেক উঁচু, পাঁচ-তলা, ছ-তলা। যেদিকটা চেপ্টা, তারই উপর তলায় একটা কাঠের

বারান্দা বার করা থাকত। তারি সামনে কমাণ্ডারেব ঘর—বৈঠক। আশে পাশে অফিসারদের। তারপর একটা মস্ত ছাত—উপর খোলা। ছাতের ওপাশে আবার দু-চারটি ঘর। নিচের তলায়ও ঐ রকম ঢাকা দালান, তার নিচেও দালান; তার নিচে দালান এবং মাল্লাদের শোবার স্থান খাবার স্থান ইত্যাদি। প্রত্যেক তলার দালানের দু-পাশে তোপ বসানো, সারি সারি দ্যালের গায়ে কাটা, তার মধ্য দিয়ে তোপের মুখ—দু-পাশে রাশিকৃত গোলা (আর যুদ্ধের সময় বারুদের থলে)। তখনকার যুদ্ধ-জাহাজের প্রত্যেক তলাই বড় নিচু ছিল; মাথা হেঁট করে চলতে হত। তখন নৌ-যোদ্ধা যোগাড় করতেও অনেক কষ্ট পেতে হতো। সরকারের হুকুম ছিল যে যেখান থেকে পার ধরে, বেঁধে, ভুলিয়ে লোক নিয়ে যাও। মায়ের কাছ থেকে ছেলে, স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী—জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। একবার জাহাজে তুলতে পারলে হয়, তারপর—বেচারা কখন হয়তো জাহাজে চড়েনি—একেবারে হুকুম হল, মাস্তুলে ওঠ। ভয় পেযে হুকুম না শুনলেই চাবুক। কতক মরেও যেত। আইন করলেন আমীরেরা, দেশ-দেশান্তরের বাণিজ্য লুটপাট করবার জন্য; রাজস্বভোগ করবেন তাঁরা, আর গরিবদের খালি রক্তপাত, শরীরপাত, যা চিরকাল এ পৃথিবীতে হয়ে আসছে!! এখন ও-সব আইন নেই, এখন আর 'প্রেস গ্যাঙ্গের' নামে চাষা-ভূষোর হৃৎকম্প হয় না। এখন খুশির সওদা; তবে অনেকগুলি চোর-ছ্যাঁচড় ছোঁড়াকে জেলে না দিয়ে এই যুদ্ধ- জাহাজে নাবিকের কর্ম শেখানো হয়।

বাষ্পবল এ সমস্তই বদলে ফেলেছে। এখন 'পাল'-জাহাজ প্রায় অনাবশ্যক বাহার। হাওয়ার সহায়তার উপর নির্ভর বড়ই অল্প। ঝড়ঝাপটার ভয়ও অনেক কম। কেবল জাহাজ না পাহাড়-পর্বতে ধাক্কা খায়, এই বাঁচাতে হয়। যুদ্ধ-জাহাজ তো একেবারে পূর্বের অবস্থার সঙ্গে বিলকুল পৃথক। দেখে তো জাহাজ বলে মনেই হয় না। এক-একটি ছোট বড় ভাসন্ত লোহার কেল্লা। তোপও সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। তবে এখনকার কালের তোপের কাছে সে প্রাচীন তোপ ছেলেখেলা বই তো নয়। আর এ যুদ্ধ-জাহাজের বেগই বা কি! সব চেয়ে ছোটগুলি 'টরপিডো' ছুঁড়বার জন্য, তার চেয়ে একটু বড়গুলি শত্রুর বাণিজ্যপোত দখল করতে, আর বড়-বড়গুলি হচ্চেন বিরাট যুদ্ধের আয়োজন।

আমেরিকা ইউনাইটেড স্টেট্‌সের সিভিল ওয়ারের সময়, ঐকরাজ্যপক্ষেরা[১] একখান কাঠের জঙ্গি জাহাজের গায় কতকগুলো লোহার রেল সারি সারি বেঁধে ছেয়ে দিয়েছিল। বিপক্ষের গোলা তার গায়ে লেগে, ফিরে যেতে লাগলো, জাহাজের কিছুই বড় করতে পারলে না। তখন মতলব করে, জাহাজের গা লোহা দিয়ে জোড়া হতে লাগলো, যাতে দুশমনের গোলা কাষ্ঠভেদ না করে। এদিকে জাহাজি তোপেরও তালিম বাড়তে চলল—তা-বড় তা-বড় তোপ; তোপ—যাতে আর হাতে সরাতে, হটাতে, ঠাস্‌তে, ছুঁড়তে হয় না, সব কলে হয়। পাঁচ-শ লোক যাকে একটুকুও হেলাতে পারে না, এমন তোপ, একটা ছোট ছেলে কল টিপে যে দিকে ইচ্ছে মুখ ফেরাচ্চে, নাবাচ্চে ও ঠাসছে, ভরছে, আওয়াজ করছে— আবার তাও চকিতের ন্যায়! যেমন জাহাজের লোহার দ্যাল মোটা হতে লাগলো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বজ্রভেদী তোপেরও সৃষ্টি হতে চলল। এখন জাহাজখানি ইস্পাতের দ্যাল-ওযালা কেল্লা, আর তোপগুলি যমের ছোট ভাই। এক গোলার ঘায়ে, যত বড় জাহাজই হন না, ফেটে চুটে চৌ- চাকলা! তবে এই 'লুয়ার বাসর ঘর', যা নকিন্দরের বাবা স্বপ্নেও ভাবেনি; এবং যা 'সাতালি পর্বতে'র ওপর না দাঁড়িয়ে সত্তর হাজার পাহাড়ে ঢেউয়ের মাথায় নেচে নেচে বেড়ায়, ইনিও 'টরপিডো'র ভয়ে অস্থির। তিনি হচ্চেন কতকটা চুরুটের চেহারা একটি নল; তাঁকে তাগ করে ছেড়ে দিলে তিনি জলের মধ্যে মাছের মতো ডুবে ডুবে চলে যান। তারপর যেখানে লাগবার, সেখানে ধাক্কা যেই লাগা, অমনি তার মধ্যের রাশীকৃত মহাবিস্তারশীল পদার্থসকলের বিকট আওয়াজ ও বিস্ফোরণ. সঙ্গে সঙ্গে যে জাহাজের নিচে এই কীর্তিটা হয়, তার 'পুনর্মূষিকো ভব' অর্থাৎ লৌহত্বে ও কাটকুটোত্বে কতক এবং বাকিটা ধুমত্বে ও অগ্নিত্বে পরিণমন! মনিষ্যিগুলো, যারা এই টরপিডো ফাটবার মুখে পড়ে যায়, তাদেরও যা খুঁজে পাওয়া যায়, তা প্রায় 'কিমা'তে পরিণত অবস্থায়! এই সকল জঙ্গি জাহাজ তৈয়ার হওয়া অবধি জলযুদ্ধ আর বেশি হতে হয় না। দু-একটা লড়াই আর একটা বড় জঙ্গি ফতে বা একদম হার। তবে এই রকম জাহাজ নিয়ে লড়াই হবার পূর্বে, লোকে যেমন ভাবতো যে দু-পক্ষের কেউ বাঁচবে না, আর একদম সবে উড়ে পুড়ে যাবে, তত কিছু হয় না।

---

১ Unionist Party

ময়দানি জঙ্গের সময়, তোপ-বন্দুক থেকে উভয় পক্ষের উপর যে মুষলধারা গোলাগুলি সম্পাত হয়, তার এক হিস্‌সে যদি লক্ষ্যে লাগে তো উভয় পক্ষের ফৌজ মরে দু-মিনিটে ধুন হয়ে যায়। সেই প্রকার দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের গোলা, যদি ৫০০ আওযাজের একটা লাগতো তো উভয় পক্ষের জাহাজের নাম নিশানাও থাকতো না। আশ্চর্য এই যে, যত তোপ-বন্দুক উৎকর্ষ লাভ করছে, বন্দুকের যত ওজন হালকা হচ্চে, যত নালের কিরকিরার পরিপাটি হচ্চে, যত পাল্লা বেড়ে যাচ্চে, যত ভরবার ঠাসবার কলকব্জা হচ্চে, যত তাড়াতাড়ি আওয়াজ হচ্চে, ততই যেন গুলি ব্যর্থ হচ্চে! পুরানো ঢঙের পাঁচ হাত লম্বা তোড়াদার জজেল, যাকে দোঠেঙ্গো কাঠের উপর রেখে, তাগ করতে হয়, এবং ফুঁ ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়, তাই-সহায় বারাখজাই, আফ্রিদ আদ্‌মি অব্যর্থসন্ধান—আর আধুনিক সুশিক্ষিত ফৌজ, নানা-কল-কারখানা-বিশিষ্ট বন্দুক-হাতে, মিনিটে ১৫০ আওয়াজ করে খালি হাওয়া গরম করে! অল্প স্বল্প কলকব্জা ভাল। মেলা কলকব্জা মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপাপত্তি করে জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানায় লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর সেই একঘেয়ে কাজই করছে—এক এক দলে এক একটা জিনিসের এক এক টুকরোই গড়ছে। পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগু-পেছুই কচ্চে—আজন্ম। ফল্‌, ঐ কাজটিও খোয়ান, আর তার মরণ—খেতেই পায় না। জড়ের মতো একঘেয়ে কাজ করতে করতে জড়বৎ হয়ে যায়। স্কুলমাস্টারি, কেরানিগিরি করে ঐ জন্যই হস্তিমূর্খ জড়পিণ্ড তৈয়ার হয়!

বাণিজ্য-যাত্রী জাহাজের গড়ন অন্য ঢঙের। যদিও কোন কোন বাণিজ্য-জাহাজ এমন ঢঙে তৈয়ার যে, লড়ায়ের সময় অত্যল্প আয়াসেই দু-চারটা তোপ বসিয়ে অন্যান্য নিরস্ত্র পণ্যপোতকে তাড়াহুড়ো দিতে পারে এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকার হতে সাহায্য পায়, তথাপি সাধারণতঃ সমস্তগুলিই যুদ্ধপোত হতে অনেক তফাৎ। এ সকল জাহাজ প্রায়ই এখন বাষ্পপোত এবং প্রায় এত বৃহৎ ও এত দাম লাগে যে, কোম্পানি ভিন্ন একলার জাহাজ নাই বললেই হয়। আমাদের দেশের ও ইওরোপের বাণিজ্যে পি.এণ্ড ও. কোম্পানি সকলের অপেক্ষা প্রাচীন ও ধনী: তারপর, বি.আই.এস্‌.এন্‌ কোম্পানি; আরও অনেক কোম্পানি আছে। ভিন্ন সরকারের মধ্যে মেসাজারি মারিতীম (Messageries Maritimes) ফরাসী, অষ্ট্রিয়ান লয়েড, জার্মান

লয়েড এবং ইতালিয়ান রুবাটিনো কোম্পানি প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে পি. এণ্ড ও. কোম্পানি যাত্রী-জাহাজ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ক্ষিপ্রগামী—লোকের এই ধারণা। মেসাজাবির ভক্ষ্য- ভোজ্যের বড়ই পাবিপাট্য।

এবার আমরা যখন আসি, তখন ঐ দুই কোম্পানিই প্লেগের ভয়ে কালা আদমী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং আমাদের সবকারের একটা আইন আছে যে, যেন কোন কালা আদমী এমিগ্রাণ্ট অফিসের সার্টিফিকেট ভিন্ন বাহিরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্চি, কেউ আমায় ভুলিযে-ভালিযে কোথাও বেচবাব জন্য বা কুলি কববার জন্য নিয়ে যাচ্চে না, এইটি তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় নিলে। এই আইন এতদিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে; অর্থাৎ যে কেউ 'নেটিভ' বাহিরে যাচ্চে, তা যেন সরকাব টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত, অমুক ছোট জাত; সরকারের কাছে সব 'নেটিভ'। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সব এক জাত—'নেটিভ'। কুলির আইন, কুলির যে পরীক্ষা, তা সকল 'নেটিভে'র জন্য—ধন্য ইংরেজ সরকার! একক্ষণের জন্যও তোমাব কৃপায় সব 'নেটিভে'র সঙ্গে সমত্ব বোধ কল্লেম। বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শবীরের পয়দা হওয়ায়, আমি তো চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য! তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে—কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা! তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য! আর শুনি, ওঁরা আর ইংরেজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই; ওঁরা কালা আদমী নন। এ দেশে দয়া করে এসেছেন, ইংরেজের মতো। আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পরদা ইত্যাদি ইত্যাদি—ও-সব ওঁদের ধর্মে আদৌ নাই। ও-সব ঐ কায়েত-ফায়েতের বাপ-দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্মের মতো। ওঁদের বাপ-দাদা ঠিক ইংরেজদের মতো ছিল; কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল। এখন এস না এগিয়ে? সব 'নেটিভ' সরকার বলছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁচ কম-বেশি বোঝা যায় না; সরকার বলছেন, সব 'নেটিভ'। সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বলো? ও টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বলো?

যত দোষ হিঁদুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে গেলে, লাথি-ঝাঁটার চোটটা বেশি বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরেজ রাজ! তোমার ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ তো হয়েছেই, আরও হোক, আরও হোক। কপনি, ধুতির টুকরো পরে বাঁচি। তোমার কৃপায় শুধু-পায়ে শুধু-মাথায় হিল্লি দিল্লি যাই, তোমার দয়ার হাত চুবড়ে সপাসপ দাল-ভাত খাই। দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, কবতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ! পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কব্‌লা। 'সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।' ধন্য ইংরেজ সরকার! তোমার 'তখ্‌ৎ তাজ অচল রাজধানী' হউক।

আর যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বললে 'ও চেহারা এখানে চলবে না'! মনে করলুম, বুঝি পাগড়ি-মাথায় গেরুয়া রঙের বিচিত্র ধোকড়া-মন্ত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হল না; তা একটা ইংরেজী কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা; সে বুঝিয়ে দিলে বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বলবে না, কিন্তু ইউরোপী পোশাক পরলেই মুশকিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু-একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যায়, খাবার-দোকানে গেলুম, 'অমুক জিনিসটা দাও'; বললে 'নেই'। 'ঐ যে রয়েচে'। 'ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্চে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।' 'কেন হে বাপু?' 'তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।' তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মতো ভাল লাগতে লাগলো। যাক পাপ কালা আর ধলা, আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য রক্ত, উনি চার পো, উনি দেড় ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাঁচ্চা বেশি ইত্যাদি— বলে 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চৌদ্দ সিকে।' একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্চি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্‌!' কিন্তু মজাটি দেখছ? জাতের বেশি বিট্‌লেমিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সেখানে!

বাষ্পপোত বায়ুপোত অপেক্ষা অনেক বড় হয়। যে সকল বাষ্পপোত আটলান্টিক পারাপার করে, তার এক একখান আমাদের এই 'গোলকোণ্ডা'[১] জাহাজের ঠিক দেড়া। যে জাহাজে করে জাপান হতে পাসিফিক্ পার হওয়া গিয়েছিল, তাও ভারি বড় ছিল। খুব বড় জাহাজের মাঝখানে প্রথম শ্রেণী, দু-পাশে খানিকটা জায়গা, তারপর দ্বিতীয় শ্রেণী ও 'স্ট্রীয়ারেজ' এদিক ওদিকে। আর এক সীমায় খালাসীদের ও চাকরদের স্থান। স্ট্রীয়ারেজ যেন তৃতীয় শ্রেণী; তাতে খুব গরিব লোকে যায়, যারা আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ করতে যাচ্চে। তাদের থাকবার স্থান অতি সামান্য এবং হাতে হাতে আহার দেয়। যে সকল জাহাজ হিন্দুস্থান ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত করে, তাদের স্ট্রীয়ারেজ নাই, তবে ডেকযাত্রী আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীব মধ্যে খোলা জায়গা, সেই স্থানটায তারা বসে শুযে যায। তা দূর-দূরের যাত্রায় তো একটিও দেখলুম না। কেবল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে যাবার সময়, বম্বে থেকে কতকগুলি চীনে লোক বরাবর হংকং পর্যন্ত ডেকে গিয়েছিল।

ঝড়-ঝাপটা হলেই ডেকযাত্রীর বড় কষ্ট, আর কতক কষ্ট যখন বন্দবে মাল নাবায। এক উপরে 'হরিকেন ডেক' ছাড়া সব ডেকের মধ্যে একটা করে মস্ত চৌকা কাটা আছে, তারই মধ্য দিয়ে মাল নাবায় এবং তোলে। সেই সময় ডেক-যাত্রীদের একটু কষ্ট হয়। নতুবা কলিকাতা হতে সুয়েজ পর্যন্ত এবং গবমেব দিনে ইউবোপেও ডেকে বড় আরাম। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীব যাত্রীরা তাঁদের সাজান গুজানো কামরার মধ্যে গরমের চোটে তরলমূর্তি ধববাব চেষ্টা করছেন, তখন ডেক যেন স্বর্গ। দ্বিতীয় শ্রেণী—এ-সব জাহাজের বড়ই খারাপ। কেবল এক নূতন জার্মান লয়েড কোম্পানি হয়েছে; জার্মানির বের্গেন নামক শহর হতে অস্ট্রেলিয়ায় যায়; তাদের দ্বিতীয শ্রেণী বড় সুন্দর, এমন কি 'হবিকেন ডেকে' পর্যন্ত ঘর আছে এবং খাওয়া-দাওয়া প্রায় গোলকোণ্ডার প্রথম শ্রেণীর মতো। সে লাইন কলম্বো ছুঁয়ে যায়। এ গোলকোণ্ডার জাহাজে 'হরিকেন ডেকে'র উপর কেবল দুটি ঘর আছে; একটি এ পাশে, একটি ও পাশে। একটিতে থাকেন ডাক্তার,

১ বি. আই. এস. এন. কোম্পানিব একখানি জাহাজেব নাম। ঐ জাহাজে স্বামীজী দ্বিতীযবাব বিলাত যাত্রা কবেন

আর একটি আমাদের দিয়েছিল। কিন্তু গরমের ভয়ে আমরা নিচের তলায় পালিয়ে এলুম। ঐ ঘরটি জাহাজের ইঞ্জিনের উপর। জাহাজ লোহার হলেও যাত্রীদের কামরাগুলি কাঠের; ওপর নিচে, সে কাঠের দেয়ালে বায়ুসঞ্চারের জন্য অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। দ্যালগুলিতে 'আইভরি পেন্ট' লাগান; এক একটি ঘরে তার জন্য প্রায় পঁচিশ পাউণ্ড খরচ পড়েছে। ঘরের মধ্যে একখানি ছোট কার্পেট পাতা। একটি দ্যালের গায় দুটি খুরোহীন লোহার খাটিয়ার মতো এঁটে দেওয়া; একটির উপর আর একটি। অপর দ্যালেও ঐ রকম একখানি 'সোফা'। দরজার ঠিক উল্টা দিকে মুখ-হাত ধোবার জায়গা তার উপর একখান আরসি, দুটো বোতল, খাবার জলের দুটো গ্লাস। ফি-বিছানার গায়ের দিকে একটি করে জালতি পেতলের ফ্রেমে লাগান। ঐ জালতি ফ্রেম সহিত দ্যালের গায়ে লেগে যায়, আবার টানলে নেবে আসে। রাত্রে যাত্রীদের ঘড়ি প্রভৃতি অত্যাবশক জিনিসপত্র তাইতে রেখে শোয়। নিচের বিছানার নিচে সিন্দুক প্যাটরা রাখবার জায়গা। সেকেণ্ড ক্লাসের ভাবও ঐ, তবে স্থান সঙ্কীর্ণ ও জিনিসপত্র খেলো। জাহাজি কারবারটা প্রায় ইংরেজের একচেটে। সেজন্য অন্যান্য জাতেরা যে সকল জাহাজ করেছে, তাতেও ইংরেজযাত্রী অনেক বলে খাওয়া-দাওয়া অনেকটা ইংরেজদের মতো করতে হয়। সময়ও ইংরেজী-রকম করে আনতে হয়। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে, রুশিয়াতে খাওয়া-দাওয়ায় এবং সময়ে অনেক পার্থক্য আছে। যেমন আমাদের ভারতবর্ষে—বাঙলায়, হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাতে, মাদ্রাজে তফাৎ। কিন্তু এ সকল পার্থক্য জাহাজে অল্প দেখা যায়। ইংরেজীভাষী যাত্রীর সংখ্যাধিক্যে ইংরেজী ঢঙে সব গড়ে যাচ্চে।

বাষ্পপোতে সর্বেসর্বা কর্তা হচ্চেন 'কাপ্তেন'। পূর্বে 'হাই সী'তে[১] কাপ্তেন জাহাজে রাজত্ব করতেন; কাউকে সাজা দিতেন, ডাকাত ধরে ফাঁসি দিতেন, ইত্যাদি। এখন অত নাই, তবে তাঁর হুকুমই আইন—জাহাজে তাঁর নিচে চারজন 'অফিসার' বা (দিশি নাম) 'মালিম', তারপর চার পাঁচ জন ইঞ্জিনিয়র। তাদের যে 'চিফ', তার পদ অফিসারের সমান, সে প্রথম

১ সমুদ্রের যেখানে কোন দিকের কূলকিনাবা দেখা যায় না, অথবা যেখান হইতে নিকটবর্তী উপকূল দুই তিন দিনের পথ

শ্রেণীতে খেতে পায়। আর আছে চার পাঁচ জন 'সুকানি'—যারা হাল ধরে থাকে পালাক্রমে, এরাও ইওরোপী। বাকি সমস্ত চাকর-বাকর, খালাসী, কয়লাওয়ালা হচ্ছে দেশী লোক, সকলেই মুসলমান। হিন্দু কেবল বোম্বায়ের তরফে দেখেছিলুম, পি. এণ্ড ও. কোম্পানির জাহাজে। চাকররা এবং খালাসীরা কলকাতার, কয়লাওয়ালারা পূর্ববঙ্গের, রাঁধুনীরাও পূর্ববঙ্গের ক্যাথলিক ক্রিশ্চান। আর আছে চারজন মেথর। কামরা হতে ময়লা জল সাফ প্রভৃতি মেথররা করে, স্নানের বন্দোবস্ত করে, আর পায়খানা প্রভৃতি দুরস্ত রাখে। মুসলমান চাকর-খালাসীরা ক্রিশ্চানের রান্না খায় না; তাতে আবার জাহাজে প্রত্যহ শোর ত আছেই। তবে অনেকটা আড়াল দিয়ে কাজ সারে। জাহাজের রান্নাঘরের তৈয়ারি রুটি প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে খায় এবং যে সকল কলকেত্তাই চাকর নয়া রোস্‌নাই পেয়েছে, তারা আড়ালে খাওয়া-দাওযা বিচার করে না। লোকজনদের তিনটা 'মেস' আছে। একটা চাকরদের, একটা খালাসীদের, একটা কয়লাওয়ালাদের; একজন করে ভাণ্ডারী অর্থাৎ রাঁধুনি আর একটি চাকর কোম্পানি ফি-মেসকে দেয়। ফি-মেসের একটা রাঁধবার স্থান আছে। কলকাতা থেকে কতক হিঁদু ডেকযাত্রী কলম্বোয় যাচ্ছিল; তারা ঐ ঘরে চাকরদের রান্না হয়ে গেলে রেঁধে খেত। চাকর-বাকররা জলও নিজেরা তুলে খায়। ফি ডেকে দ্যালের গায় দুপাশে দুটো 'পম্প'; একটি নোনা, একটি মিঠে জলের, সেখান হতে মিঠে জল তুলে মুসলমানেরা ব্যবহার করে। যে-সকল হিঁদুর কলের জলে আপত্তি নাই, খাওয়াদাওয়ার সম্পূর্ণ বিচার রক্ষা করে এই সকল জাহাজে বিলাত প্রভৃতি দেশে যাওয়া তাদের অত্যন্ত সোজা। রান্নাঘর পাওযা যায়, কারুর ছোঁয়া জল খেতে হয় না, স্নানের পর্যন্ত জল অন্য কোন জাতেব ছোঁবার আবশ্যক নাই; চাল ডাল শাক পাত মাছ দুধ ঘি সমস্তই জাহাজে পাওয়া যায়, বিশেষ এই সকল জাহাজে দেশী লোক সমস্ত কাজ করে বলে ডাল চাল মূলো কপি আলু প্রভৃতি রোজ রোজ তাদের বার করে দিতে হয়। এক কথা—'পয়সা'। পয়সা থাকলে একলাই সম্পূর্ণ আচার রক্ষা করে যাওয়া যায়।

এই সকল বাঙালী লোকজন প্রায় আজকাল সব জাহাজে—যেগুলি কলকাতা হতে ইওরোপে যায়। এদের ক্রমে একটা জাত সৃষ্টি হচ্চে; কতকগুলি জাহাজী পারিভাষিক শব্দেরও সৃষ্টি হচ্চে। ক্যাপ্তেনকে এরা বলে

—'বাড়িওয়ালা', অফিসার—'মালিম', মাস্তুল—'ডোল', পাল—'সড়', নামাও—'আরিয়া', ওঠাও—'হাবিস' (heave) ইত্যাদি।

খালাসীদের এবং কয়লাওয়ালাদের একজন করে সরদার আছে, তার নাম 'সারেঙ্গ', তার নিচে দুই তিন জন 'টিণ্ডাল', তারপর খালাসী বা কয়লাওয়ালা।

খানসামাদের (boy) কর্তার নাম 'বট্‌লার' (butler) ; তার ওপর একজন গোরা 'স্টুয়ার্ড'। খালাসীরা জাহাজ ধোওয়া-পোঁছা, কাছি ফেলা তোলা, নৌকা নামান ওঠান, পাল তোলা, পাল নামান (যদিও বাষ্পপোতে ইহা কদাপি হয়) ইত্যাদি কাজ করে। সারেঙ্গ ও টিণ্ডালরা সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, এবং কাজ করছে। কয়লাওয়ালা এঞ্জিন-ঘরে আগুন ঠিক রাখছে ; তাদের কাজ দিনরাত আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর এঞ্জিন ধুয়ে পুঁছে সাফ রাখা। সে বিরাট এঞ্জিন, আর তার শাখাপ্রশাখা সাফ রাখা কি সোজা কাজ ? 'সারেঙ্গ' এবং তার 'ভাই' আসিস্টান্ট সারেঙ্গ কলকাতার লোক, বাঙলা কয়, অনেকটা ভদ্রলোকের মতো ; লিখতে পড়তে পারে, স্কুলে পড়েছিল, ইংরেজীও কয়—কাজ চালানো। সারেঙ্গের তের বছরের ছেলে কাপ্তেনের চাকর—দরজায় থাকে আরদালী। এই সকল বাঙালী খালাসী, কয়লাওয়ালা, খানসামা প্রভৃতির কাজ দেখে স্বজাতির উপর যে একটা হতাশ বুদ্ধি আছে, সেটা অনেকটা কমে গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে আসছে, কেমন সবলশরীর হয়েছে, কেমন নির্ভীক অথচ শান্ত ! সে নেটিভি পা-চাটা ভাব মেথরগুলোরও নেই—কি পরিবর্তন !

দেশী মাল্লারা কাজ করে ভাল, মুখে কথাটি নাই, আবার সিকিখানা গোরার মাইনে। বিলাতে অনেকে অসন্তুষ্ট ; বিশেষ—অনেক গোরার অন্ন যাচ্ছে দেখে, খুশি নয়। তারা মাঝে মাঝে হাঙ্গামা তোলে। আর তো কিছু বলবার নেই ; কাজে গোরার চেয়ে চটপটে। তবে বলে, ঝড়-ঝাপটা হলে, জাহাজ বিপদে পড়লে এদের সাহস থাকে না। হরিবোল হরি ! কাজে দেখা যাচ্ছে—ও অপবাদ মিথ্যা। বিপদের সময় গোরাগুলো ভয়ে, মদ খেয়ে, জড় হয়ে নিকম্মা হয়ে যায়। দেশী খালাসী এক ফোঁটা মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্যন্ত কোন মহা বিপদে একজনও কাপুরুষত্ব দেখায়নি। বলি, দেশী সেপাই কি কাপুরুষত্ব দেখায় ? তবে নেতা চাই। জেনারেল

স্ট্রঙ্ নামক এক ইংরেজ বন্ধু সিপাহী-হাঙ্গামার সময় এদেশে ছিলেন। তিনি 'গদরে'র গল্প অনেক করতেন। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা গেল যে, সিপাহীদের এত তোপ বারুদ রসদ হাতে ছিল, আবার তারা সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী, তবে এমন করে হেরে মলো কেন? জবাব দিলেন যে, তাদের মধ্যে যারা নেতা হয়েছিল, সেগুলো অনেক পেছনে থেকে 'মারো বাহাদুর —লড়ো বাহাদুর' করে চেঁচাচ্ছিল; অফিসার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি সিপাহী লড়ে? সকল কাজেই এই। 'শিরদার তো সরদার' মাথা দিতে পার তো নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছুই হয় না, কেউ মানে না!

ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ। তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি! 'যাদের চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা। তোমাদের বাড়ি-ঘর-দুয়ার মিউজিয়াম, তোমাদের আচার-ব্যবহার, চালচলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূতকাল—লুঙ্ লঙ্ লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্তমানকালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ—লোপ্ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি করছ কেন? ভূত-ভারত- শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্চ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনেব পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া

উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য- কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি—'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে'।[১]

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্চে। এ সমুদ্র নাকি বড়ই গভীর। যেটুকু অল্প-জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুঁড়িয়ে পশ্চিম ধুয়ে এনে, বুজিয়ে জমি করে নিয়েছেন। সে জমি আমাদের বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশ আর বড় এগুচ্চেন না, ঐ সোঁদরবন পর্যন্ত। কেউ বলেন, সোঁদরবন পূর্বে গ্রাম-নগর-ময় ছিল, উচ্চ ছিল। অনেকে এখন ও-কথা মানতে চায় না। যাহোক ঐ সোঁদরবনের মধ্যে আর বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে অনেক কারখানা হয়ে গেছে। এই সকল স্থানেই পোর্তুগিজ বম্বেটেদের আড্ডা হয়েছিল; আরাকান-রাজের এই সকল স্থান অধিকারের বহু চেষ্টা, মোগল-প্রতিনিধির গঞ্জালেজ প্রমুখ পোর্তুগিজ বম্বেটেদের শাসিত করবার নানা উদ্যোগ; বারংবার ক্রিশ্চান, মোগল, মগ, বাঙালীর যুদ্ধ।

১ গুরুজীর জয়, গুরুই ধন্য হউন, গুরুই জয়যুক্ত হউন। উহা পঞ্জাবপ্রদেশের শিখসম্প্রদায়ের উৎসাহবাক্য এবং রণসঙ্কেত

৩

দক্ষিণী সভ্যতা

একে বঙ্গোপসাগর স্বভাবচঞ্চল, তাতে আবার এই বর্ষাকালে, মৌসুমের সময়, জাহাজ খুব হেলতে দুলতে যাচ্চেন। তবে এইতো আরম্ভ, পরে বা কি আছে! যাচ্চি মাদ্রাজ। এই দাক্ষিণাত্যের বেশির ভাগই এখন মাদ্রাজ। জমিতে কি হয়? ভাগ্যবানের হাতে পড়ে মরুভূমিও স্বর্গ হয়।) নগণ্য ক্ষুদ্র মাদ্রাজ শহর যার নাম চিন্নাপট্টনম্, অথবা মাদ্রাসপট্টনম্, চন্দ্রগিরির রাজা একদল বণিককে বেচেছিল। তখন ইংরেজের ব্যবসা জাভায়। বাস্তাম শহর ইংরেজদিগের আশিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্র। মাদ্রাজ প্রভৃতি ইংরেজী কোম্পানিব ভারতবর্ষের সব বাণিজ্যস্থান বাস্তামের দ্বারা পরিচালিত। সে বাস্তাম কোথায়? আর সে মাদ্রাজ কি হয়ে দাঁড়াল! শুধু 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ' নয় হে ভায়া; পেছনে মায়ের বল। তবে উদ্যোগী পুরুষকেই মা বল দেন—এ কথাও মানি। মাদ্রাজ মনে পড়লে খাঁটি দক্ষিণদেশ মনে পড়ে। যদিও কলকেতার জগন্নাথের ঘাটেই দক্ষিণ- দেশের আমেজ পাওয়া যায় (সেই থর-কামানো মাথা, ঝুঁটি বাঁধা, কপালে অনেক চিত্র-বিচিত্র, শুঁড়-ওলটানো চটিজুতো, যাতে কেবল পায়ের আঙুল- কটি ঢোকে, আর নস্যদরবিগলিত নাসা, ছেলেপুলের সর্বাঙ্গে চন্দনের ছাপা লাগাতে মজবুত) উড়ে বামুন দেখে। গুজরাতি বামুন, কালো কুচকুচে দেশস্থ বামুন, ধপধপে ফরসা বেরালচোখো চৌকা-মাথা কোকনস্থ বামুন, সব ঐ এক প্রকার বেশ, সব দক্ষিণী বলে পরিচিত—অনেক দেখেছি, কিন্তু ঠিক দক্ষিণী ঢং মাদ্রাজীতে। সে রামানুজী তিলক-পরিব্যাপ্ত ললাটমণ্ডল—দূর থেকে যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য কেলে হাঁড়িতে চুন মাখিয়ে পোড়া কাঠের ডগায় বসিয়েছে, যে-তিলকের সাগরেদ রামানন্দী তিলকের মহিমা সম্বন্ধে লোকে বলে, 'তিলক তিলক সবকোই কহে, পর রামানন্দী তিলক দিখত গঙ্গা-পারসে যম গৌদ্বারকে খিড়ক্!' (আমাদের দেশে চৈতন্য- সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া গোসাঁই দেখে মাতাল চিতেবাঘ ঠাওরেছিল —এ মাদ্রাজী তিলক দেখে চিতেবাঘ গাছে চড়ে!); আর সে তামিল তেলেগু মলয়ালম্ বুলি—যা ছয় বৎসর শুনেও এক বর্ণ বোঝবার জো নাই, যাতে দুনিয়ার রকমারি ল-কার

ও ড-কারের কারখানা; আর সেই 'মুডগ্‌তন্নির রসম্'[১] সহিত ভাত সাপড়ানো—যার এক এক গরাসে বুক ধড়ফড় করে ওঠে (এমনি ঝাল আর তেঁতুল!); সে 'মিঠে-নিমের পাতা, ছোলার দাল, মুগের দাল, ফোড়ন, দধ্যোদন' ইত্যাদি ভোজন; আর সে রেড়ির তেল মেখে স্নান, রেড়ির তেলে মাছ ভাজা—এ না হলে কি দক্ষিণ মুলুক হয়?

আবার এই দক্ষিণ মুলুক, মুসলমান রাজত্বের সময় এবং তার কত দিনের আগে থেকেও হিন্দুধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দক্ষিণ মুলুকেই— সামনে টিকি, নারকেল-তেলখেকো জাতে—শঙ্করাচার্যের জন্ম; এই দেশেই রামানুজ জন্মেছিলেন; এই মধ্বমুনিব জন্মভূমি। এঁদেরই পায়ের নিচে বর্তমান হিন্দুধর্ম। তোমাদেব চৈতন্যসম্প্রদায় এ মধ্বসম্প্রদাযের শাখামাত্র; ঐ শঙ্করের প্রতিধ্বনি কবীর, দাদু, নানক, রাম-সনেহী প্রভৃতি সকলেই; ঐ রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায় অযোধ্যা প্রভৃতি দখল করে বসে আছে। এই দক্ষিণী ব্রাহ্মণরা হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকাব করে না, শিষ্য করতে চায না, সে-দিন পর্যন্ত সন্ন্যাস দিত না। এই মাদ্রাজীরাই এখনও বড় বড় তীর্থস্থান দখল করে বসে আছে। এই দক্ষিণদেশেই— যখন উত্তরভারতবাসী 'আল্লা হু আক্‌বর, দীন্ দীন্' শব্দেব সামনে ভয়ে ধনরত্ন ঠাকুর-দেবতা স্ত্রী-পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল, [তখন] রাজচক্রবর্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণদেশেই সেই অদ্ভুত সায়ণের জন্ম—যাঁর যবনবিজয়ী বাহুবলে বুক্কবাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নয়মার্গে[২] দাক্ষিণাত্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাঁর অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সমগ্র বেদরাশির টীকা, যাঁর আশ্চর্য ত্যাগ বৈরাগ্য ও গবেষণার ফলস্বরূপ 'পঞ্চদশী' গ্রন্থ—সেই সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যমুনি সায়ণের[৩] এই জন্মভূমি। মাদ্রাজ সেই 'তামিল' জাতির আবাস, যাদের সভ্যতা সর্বপ্রাচীন, যাদের 'সুমের' নামক শাখা 'ইউফ্রেটিস' তীরে প্রকাণ্ড সভ্যতা-বিস্তার— অতি প্রাচীনকালে করেছিল, যাদের জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি, আচার প্রভৃতি

১ অতিরিক্ত ঝাল-তেঁতুল সংযুক্ত অড়হর দালের ঝোল বিশেষ। উহা দক্ষিণীদেব প্রিয় খাদ্য। 'মুড়গ্' অর্থে ক্যল মরিচ ও 'তন্নি' অর্থে দাল

২ নয়মার্গ—নীতিমার্গ

৩ কাহাবও কাহারও মতে বেদভাষ্যকার সায়ণ বিদ্যারণ্যমুনির ভ্রাতা

আসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি, যাদের পুরাণসংগ্রহ বাইবেলের মূল, যাদের আর এক শাখা মলবর উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, যাঁদের কাছে আর্যেরা অনেক বিষয়ে ঋণী, এদেরই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীরশৈব বা বীরবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা করছে। এই যে এত বড় বৈষ্ণবধর্ম—এ-ও এই 'তামিল' নীচবংশোদ্ভূত শঠকোপ হতে উৎপন্ন, যিনি 'বিক্রীয় সূর্পং স চচার যোগী'। এই তামিল আলওয়াড় বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েছেন। এখনও এদেশে বেদান্তের দ্বৈত, বৈশিষ্ট বা অদ্বৈত—সমস্ত মতের যেমন চর্চা, তেমন আর কুত্রাপি নাই। এখনও ধর্মের অনুরাগ এদেশে যত প্রবল, তেমন আর কোথাও নাই।

চব্বিশে জুন রাত্রে আমাদের জাহাজ মাদ্রাজে পৌঁছল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে-নেওয়া মাদ্রাজের বন্দরে রয়েছি। ভেতরে স্থির জল; আর বাহিরে উত্তাল তরঙ্গ গজরাচ্চে, আর এক এক বার বন্দরের দ্যালে লেগে দশ বার হাত লাফিয়ে উঠছে, আর ফেনময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সামনে সুপরিচিত মাদ্রাজের স্ট্রাণ্ড রোড। দুজন ইংরেজ পুলিস ইন্‌স্পেক্টর, একজন মাদ্রাজী জমাদার, এক ডজন পাহারাওয়ালা জাহাজে উঠল। অতি ভদ্রতাসহকারে আমায় জানালে যে, কালা আদমীর কিনারায় যাবার হুকুম নাই, গোরার আছে। কালা যেই হোক না কেন, সে যে রকম নোংরা থাকে, তাতে তার প্লেগবীজ নিয়ে বেড়াবার বড়ই সম্ভাবনা, তবে আমার জন্য মাদ্রাজীরা বিশেষ হুকুম পাবার দরখাস্ত করেছে, বোধ হয় পাবে। ক্রমে দুচারিটি করে মাদ্রাজী বন্ধুরা নৌকায় চড়ে জাহাজের কাছে আসতে লাগলো। ছোঁয়াছুঁয়ি হবার জো নাই, জাহাজ থেকে কথা কও। আলাসিঙ্গা, বিলিগিরি, নরসিংহাচার্য, ডাক্তার নঞ্জুণ্ডরাও, কিডি প্রভৃতি সকল বন্ধুদেরই দেখতে পেলুম। আঁব, কলা, নারিকেল, রাঁধা দধ্যোদন, রাশীকৃত গজা, নিমকি ইত্যাদির বোঝা আসতে লাগলো—ক্রমে ভিড় হতে লাগলো—ছেলে, মেয়ে, বুড়ো—নৌকায় নৌকা। আমার বিলাতী বন্ধু মিঃ শ্যামিএর, ব্যারিস্টার হয়ে মাদ্রাজে এসেছেন, তাঁকেও দেখতে পেলেম। রামকৃষ্ণানন্দ আর নির্ভয়[১] বারকতক আনাগোনা করলে। তারা সারাদিন সেই রৌদ্রে নৌকায়

১ স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য স্বামী নির্ভয়ানন্দ

থাকবে—শেষে ধমকাতে তবে যায়। ক্রমে যত খবর হল যে আমাকে নাবতে হুকুম দেবে না, তত নৌকার ভিড় আরও বাড়তে লাগলো। শরীরও ক্রমাগত জাহাজের বারাণ্ডায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবসন্ন হয়ে আসতে লাগলো। তখন মাদ্রাজী বন্ধুদের কাছে বিদায় চাইলাম, কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আলাসিঙ্গা 'ব্রহ্মবাদিন্' ও মাদ্রাজী কাজকর্ম সম্বন্ধে পরামর্শ করবার অবসর পায় না; কাজেই সে কলম্বো পর্যন্ত জাহাজে চলল। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়লে। তখন একটা বোল উঠল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, হাজার খানেক মাদ্রাজী স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা বন্দরের বাঁধের উপর বসেছিল—জাহাজ ছাড়তেই, তাদের এই বিদায়-সূচক রব! মাদ্রাজীরা আনন্দ হলে বঙ্গদেশের মতো হুলু দেয়।

মাদ্রাজ হতে কলম্বো চার দিন। যে তরঙ্গভঙ্গ গঙ্গাসাগর থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা ক্রমে বাড়তে লাগলো। মাদ্রাজের পর আরও বেড়ে গেল। জাহাজ বেজায় দুলতে লাগলো। যাত্রীরা মাথা ধরে ন্যাকার করে অস্থির। বাঙালীর ছেলেদুটিও ভারি 'সিক্'। একটি তো ঠাউরেছে মরে যাবে; তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেওয়া গেল যে কিছু ভয় নেই, অমন সকলেরই হয়, ওতে কেউ মরেও না, কিছুই না। সেকেণ্ড কেলাসটা আবার 'স্ক্রু'র ঠিক উপরে। ছেলেদুটিকে কালা আদমী বলে, একটা অন্ধকূপের মতো ঘর ছিল, তারি মধ্যে পুরেছে। সেখানে পবনদেবেরও যাবার হুকুম নাই, সূর্যেরও প্রবেশ নিষেধ। ছেলেদুটির ঘরের মধ্যে যাবার জো নাই; আর ছাতের উপর—সে কি দোল। আবার যখন জাহাজের সামনেটা একটা ঢেউয়ের গহ্বরে বসে যাচ্চে, আর পেছনটা উঁচু হয়ে উঠছে, তখন স্ক্রুটা জল ছাড়া হয়ে শূন্যে ঘুরছে, আর সমস্ত জাহাজটা ঢক ঢক ঢক ঢক করে নড়ে উঠছে। সেকেণ্ড কেলাসটা ঐ সময় যেমন বেরালে ইঁদুর ধরে এক একবার ঝাড়া দেয়, তেমনি করে নড়ছে।

যাই হোক এখন মন্সুনের সময়। যত—ভারত মহাসাগরে—জাহাজ পশ্চিমে চলবে, ততই বাড়বে এই ঝড়ঝাপট। মাদ্রাজীরা অনেক ফলপাকড দিয়েছিল; তার অধিকাংশ, আর গজা দধ্যোদন প্রভৃতি সমস্তই ছেলেদের দেওয়া গেল। আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনে শুধু পায়ে জাহাজে চড়ে বসল। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখন কখন জুতো পায়ে দেয়। দেশে দেশে রকমারি চাল। ইওরোপে মেয়েদের পা দেখান বড় লজ্জা; কিন্তু

আধখানা গা আদুড় রাখতে লজ্জা নেই। আমাদের দেশে মাথাটা ঢাকতে হবেই হবে, তা পরনে কাপড় থাক বা না থাক। আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার 'ব্রহ্মবাদিন্', মাইসোরি রামানুজী 'রসম্'-খেকো ব্রাহ্মণ, কামানো মাথায় সমস্ত কপাল জুড়ে 'তেংকলে' তিলক, 'সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে' এনেছেন কি দুটো পুঁটলি! একটায় চিঁড়েভাজা, আর একটায় মুড়ি-মটর। জাত বাঁচিয়ে, ঐ মুড়ি-মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে! আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিল। তাতে বেরাদারিলোক একটু গোল করবার চেষ্টা করে; কিন্তু পেরে ওঠেনি। ভারতবর্ষে ঐটুকুই বাঁচোয়া। বেরাদারি যদি কিছু না বলল তো আর কারও কিছু বলবার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদারি—কোনটায় আছেন সবশুদ্ধ পাঁচশ, কোনটায় সাতশ, কোনটায় হাজারটি প্রাণী—কনের অভাবে ভাগনিকে বে করে! যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়, যে যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ি দেখতে গিছল, তারা জাতচ্যুত হয়! যাই হোক্ এই আলাসিঙ্গার মতো মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরুভক্ত আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অল্প হে ভায়া! মাথা কামানো, ঝুঁট-বাঁধা, শুধু পায়, ধুতি-পরা মাদ্রাজী ফার্স্ট ক্লাসে উঠল; বেড়াচ্চে-চেড়াচ্চে, ক্ষিদে পেলে মুড়ি-মটর চিবুচ্চে! চাকররা মাদ্রাজী-মাত্রকেই ঠাওরায় 'চেট্টি', আর [বলে] 'ওদের অনেক টাকা আছে, কিন্তু কাপড়ও পরবে না, আর খাবেও না!' তবে আমাদের সঙ্গে পড়ে ওর জাতের দফা ঘোলা হচ্চে—চাকররা বলছে। বাস্তবিক কথা—তোমাদের পাল্লায় পড়ে মাদ্রাজীদের জাতের দফা অনেকটা ঘোলা কেন, থক্থকিয়ে এসেছে!

সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম

আলাসিঙ্গার 'সী-সিক্‌নেস্' হল না। তু-ভায়া প্রথমে একটু আধটু গোল করে সামলে বসে আছেন। চার দিন—কাজেই নানা বার্তালাপ, 'ইষ্ট-গোষ্ঠী'তে কাটালো। সামনে কলম্বো। এই সিংহল, লঙ্কা। শ্রীরামচন্দ্র সেতু বেঁধে পার হয়ে লঙ্কার রাবণ-রাজাকে জয় করেছিলেন। সেতু তো দেখেচি—সেতুপতি মহারাজার বাড়িতে, যে পাথরখানির উপর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষকে প্রথম সেতুপতি-রাজা করেন, তাও দেখেচি। কিন্তু এ পাপ বৌদ্ধ সিলোনি লোকগুলি তো মানতে চায় না! বলে— আমাদের দেশে ও কিংবদন্তী পর্যন্ত নাই। আর নাই বললে কি হবে?—'গোসাঁইজী পুঁথিতে লিখছেন যে।' তার ওপর ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা বলবে না, বলবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো—ঘাগরাপরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমান্‌ষী চেহারা! আবার —রোগা-রোগা, বেঁটে-বেঁটে, নরম-নরম শরীর! এরা রাবণ-কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি! বলে—বাঙলা দেশ থেকে এসেছিল—তা ভালই করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমান্‌ষের মতো বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকেবেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন—ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্নমেন্ট কি ঘুমুচ্চে গা? সেদিন 'পুরী'তে কাদের ধরাপাকড়া করতে গিয়ে হুলস্থূল বাধালে; বলি রাজধানীতে পাকড়া করে প্যাক করবারও যে অনেক রয়েছে।

একটা ছিল মহা দুষ্টু বাঙালী রাজার ছেলে—বিজয়সিংহ বলে। সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে, নিজের মতো আরও কতকগুলো সঙ্গী জুটিয়ে জাহাজে করে ভেসে ভেসে লঙ্কা নামক টাপুতে হাজির। তখন ওদেশে বুনো জাতের আবাস, যাদের বংশধরেরা এক্ষণে 'বেদ্দা' নামে বিখ্যাত। বুনো রাজা বড় খাতির করে রাখলে, মেয়ে বে দিলে। কিছু দিন ভাল মান্‌ষের মতো রইল; তারপর একদিন মাগের সঙ্গে যুক্তি করে, হঠাৎ

রাত্রে সদলবলে উঠে বুনো রাজাকে সরদারগণ সহিত কতল করে ফেললে। তারপর বিজয়সিংহ হলেন রাজা, দুষ্টুমির এইখানেই বড় অন্ত হলেন না তারপর আর তাঁর বুনোর-মেয়ে রানী ভাল লাগলো না। তখন ভারতবর্ষ থেকে আরও লোকজন, আরও অনেক মেয়ে আনালেন। অনুরাধা বলে এক মেয়ে তো নিজে করলেন বিয়ে, আর সে বুনোর মেয়েকে জলাঞ্জলি দিলেন; সে জাতকে জাত নিপাত করতে লাগলেন। বেচারীরা প্রায় সব মারা গেল, কিছু অংশ ঝাড়-জঙ্গলে আজও বাস করছে। এই রকম করে লঙ্কার নাম হল সিংহল, আর হল বাঙালী বদমাশের উপনিবেশ। ক্রমে অশোক মহারাজার আমলে তাঁর ছেলে মাহিন্দো আর মেয়ে সংঘমিত্তা সন্ন্যাস নিয়ে ধর্ম প্রচার করতে সিংহল টাপুতে উপস্থিত হলেন। এঁরা গিয়ে দেখলেন যে, লোকগুলো বড়ই আদাড়ে হয়ে গিয়েছে। আজীবন পরিশ্রম করে, সেগুলোকে যথাসম্ভব সভ্য করলেন, উত্তম উত্তম নিয়ম করলেন; আর শাক্যমুনির সম্প্রদায়ে আনলেন। দেখতে দেখতে সিলোনিরা বেজায় গোঁড়া বৌদ্ধ হয়ে উঠল। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড শহর বানালে, তার নাম দিলে অনুরাধাপুরম্, এখনও সে শহরের ভগ্নাবশেষ দেখলে আক্কেল হয়রান হয়ে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ, ক্রোশ ক্রোশ পাথরের ভাঙা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আরও কত জঙ্গল হয়ে রয়েছে, এখনও সাফ হয় নাই। সিলোনময় নেড়া মাথা, করোয়াধারী, হলদে চাদর-মোড়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পড়ল। জায়গায় জায়গায় বড় বড় মন্দির উঠল— মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্তি, জ্ঞান-মুদ্রা করে প্রচারমূর্তি, কাৎ হয়ে শুয়ে মহানির্বাণ- মূর্তি—তার মধ্যে। আর দ্যালের গায়ে সিলোনিরা দুষ্টুমি করলে নরকে তাদের কি হাল হয়, তাই আঁকা; কোনটাকে ভূতে ঠেঙাচ্ছে, কোনটাকে করাতে চিরছে, কোনটাকে পোড়াচ্ছে, কোনটাকে তপ্ত তেলে ভাজছে, কোনটার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্চে—সে মহা বীভৎস কারখানা! এ 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু! চীনেও ঐ হাল; জাপানেও ঐ। এদিকে তো অহিংসা, আর সাজার পরিপাটি দেখলে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র বাড়িতে ঢুকেছে— চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাক্ড়া করে, বেদম পিটছে। তখন কর্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিসনি, মারিসনি; অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' বাচ্চা-অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে চোরকে কি করা যায়?'

কর্তা আদেশ করলেন, 'ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও।' চোর জোড় হাত করে আপ্যায়িত হয়ে বললে 'আহা, কর্তার কি দয়া!'

বৌদ্ধরা বড় শান্ত, সকল ধর্মের উপর সমদৃষ্টি—এই তো শুনেছিলুম। বৌদ্ধ প্রচারকেরা আমাদের কলকেতায় এসে রং-বেরঙের গাল ঝাড়ে, অথচ আমরা তাদের যথেষ্ট পুজো করে থাকি। অনুরাধাপুরে প্রচার করছি একবার, হিঁদুদের মধ্যে—বৌদ্ধদের [মধ্যে] নয়—তাও খোলা মাঠে, কারুর জমিতে নয়। ইতিমধ্যে দুনিয়ার বৌদ্ধ 'ভিক্ষু'-গৃহস্থ, মেয়ে-মদ্দ, ঢাক ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে সে যে বিটকেল আওয়াজ আরম্ভ করলে, তা আর কি বলব! লেক্‌চার তো 'অলমিতি' হল; রক্তারক্তি হয় আর কি! অনেক করে হিঁদুদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে, আমরা নয় একটু অহিংসা করি এস —তখন শান্ত হয়।

ক্রমে উত্তর দিক থেকে হিঁদু তামিলকুল ধীরে ধীরে লঙ্কায় প্রবেশ করলে। বৌদ্ধরা বেগতিক দেখে রাজধানী ছেড়ে, কান্দি নামক পার্বত্য শহর স্থাপন করলে। তামিলরা কিছু দিনে তাও ছিনিয়ে নিলে এবং হিন্দু রাজা খাড়া করলে। তারপর এলো ফিরিঙ্গির দল, স্পানিয়ার্ড, পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ। শেষে ইংরেজ রাজা হয়েছেন। কান্দির রাজবংশ তাঞ্জোরে প্রেরিত হয়েছেন, পেনসন আর মুড়গ্‌তন্নির ভাত খাচ্চেন।

উত্তর-সিলোনে হিঁদুর ভাগ অনেক অধিক; দক্ষিণ ভাগে বৌদ্ধ, আর রং-বেরঙের দোআঁসলা ফিরিঙ্গি। বৌদ্ধদের প্রধান স্থান—বর্তমান রাজধানী কলম্বো, আর হিন্দুদের জাফনা। জাতের গোলমাল ভারতবর্ষ হতে এখানে অনেক কম। বৌদ্ধদের একটু আছে বে-থার সময়। খাওয়া-দাওয়ায় বৌদ্ধদের আদতে নেই; হিঁদুদের কিছু কিছু। যত কসাই, সব বৌদ্ধ ছিল। আজকাল কমে যাচ্ছে; ধর্ম প্রচার হচ্চে। বৌদ্ধদের অধিকাংশ ইওরোপী নাম ইন্দ্রুম-পিন্দ্রুম এখন বদলে নিচ্চে। হিঁদুদের সব রকম জাত মিলে একটা হিঁদু জাত হয়েছে; তাতে অনেকটা পাঞ্জাবী জাঠদের মতো সব জাতের মেয়ে, মায় বিবি পর্যন্ত বে করা চলে। ছেলে মন্দিরে গিয়ে ত্রিপুণ্ড্র কেটে 'শিব শিব' বলে হিঁদু হয়। স্বামী হিঁদু, স্ত্রী ক্রিশ্চান। কপালে বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্বতীপতয়ে' বললেই ক্রিশ্চান সদ্য হিঁদু হয়ে যায়। তাতেই তোমাদের উপর এখানকার পাদ্রীরা এত চটা। তোমাদের আনাগোনা হয়ে অবধি, বহুৎ ক্রিশ্চান বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্বতীপতয়ে' বলে হিঁদু হয়ে জাতে উঠেছে। অদ্বৈতবাদ

আর বীরশৈববাদ এখানকার ধর্ম। হিঁদুশব্দের জায়গায় 'শৈব' বলতে হয়। চৈতন্যদেব যে নৃত্যকীর্তন বঙ্গদেশে প্রচার করেন, তার জন্মভূমি দাক্ষিণাত্য, এই তামিল জাতির মধ্যে। সিলোনের তামিল ভাষা খাঁটি তামিল। সিলোনের ধর্ম, খাঁটি তামিল ধর্ম—সে লক্ষ লোকের উন্মাদ কীর্তন,, শিবের স্তব গান, সে হাজারো মৃদঙ্গের আওয়াজ আর বড় বড় কত্তালের ঝাঁজ, আর এই বিভূতি-মাখা, মোটা মোটা রুদ্রাক্ষ গলায়, পহলওয়ানি চেহারা, লাল চোখ, মহাবীরের মতো, তামিলদের মাতোয়ারা নাচ না দেখলে বুঝতে পারবে না।

কলম্বোর বন্ধুরা নাববার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল, অতএব ডাঙায় নেবে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাশুনা হল। স্যর কুমারস্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তাঁর স্ত্রী ইংরেজ, ছেলেটি শুধু পায়ে, কপালে বিভূতি। শ্রীযুক্ত অরুণাচলম্-প্রমুখ বন্ধুবান্ধবেরা এলেন। অনেক দিনের পর মুড়গ্তন্নি খাওয়া হল, আর কিং-কোকোনাট। ডাব কতকগুলো জাহাজে তুলে দিলে। মিসেস হিগিন্সের সঙ্গে দেখা হল, তাঁর বৌদ্ধ মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল দেখলাম। কাউন্টেসের বাড়িটি মিসেস হিগিন্সের অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজান। কাউন্টেস ঘর থেকে টাকা এনেছেন, আর মিসেস হিগিন্স ভিক্ষে করে করেছেন। কাউন্টেস নিজে গেরুয়া কাপড় বাঙলার শাড়ির মতো পরেন। সিলোনের বৌদ্ধদের মধ্যে ঐ ঢঙ খুব ধরে গেছে দেখলাম। গাড়ি গাড়ি মেয়ে দেখলাম, সব ঐ ঢঙের শাড়ি পরা।

বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ কান্দিতে দন্ত-মন্দির। ঐ মন্দিরে বুদ্ধ-ভগবানের একটি দাঁত আছে। সিলোনিরা বলে, ঐ দাঁত আগে পুরীতে জগন্নাথমন্দিরে ছিল, পরে নানা হাঙ্গামা হয়ে সিলোনে উপস্থিত হয়। সেখানেও হাঙ্গামা কম হয় নাই। এখন নিরাপদে অবস্থান করছেন! সিলোনিরা আপনাদের ইতিহাস উত্তমরূপে লিখে রেখেছে। আমাদের মতো নয়—খালি আষাঢ়ে গল্প। আর বৌদ্ধদের শাস্ত্র নাকি প্রাচীন মাগধী ভাষায়, এই দেশেই সুরক্ষিত আছে। এ স্থান হতেই ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি দেশে ধর্ম গেছে। সিলোনি বৌদ্ধেরা তাদের শাস্ত্রোক্ত এক শাক্যমুনিকেই মানে, আর তাঁর উপদেশ মেনে চলতে চেষ্টা করে; নেপালী, সিকিম, ভূটানী, লাদাকী, চীনে, জাপানীদের মতো শিবের পূজা করে না; আর 'হ্রীং তারা' ওসব জানে না। তবে ভূতটুত নামানো আছে। বৌদ্ধেরা এখন উত্তর আর দক্ষিণ দু-আম্নায় হয়ে গেছে। উত্তর আম্নায়েরা নিজেদের বলে 'মহাযান'; আর দক্ষিণী অর্থাৎ সিংহলী ব্রহ্ম সায়ামি

প্রভৃতিদের বলে 'হীনযান'। মহাযানওয়ালারা বুদ্ধের পূজা নামমাত্র করে; আসল পূজো তারাদেবীর, আর অবলোকিতেশ্বরের (জাপানি, চীনে ও কোরিয়ানরা বলে ক্বানয়ন্); আর 'হ্রীং ক্লীং' তন্ত্র-মন্ত্রের বড় ধুম; টিবেটীগুলো আসল শিবের ভূত। ওরা সব হিঁদুর দেবতা মানে, ডমরু বাজায়, মড়ার খুলি রাখে, সাধুর হাড়ের ভেঁপু বাজায়, মদ-মাংসের যম। আর খালি মন্ত্র আওড়ে রোগ ভূত প্রেত তাড়াচ্চে। চীন আর জাপানে সব মন্দিরের গায়ে 'ওঁ হ্রীং ক্লীং'—সব বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা দেখেছি। সে অক্ষর বাঙলার এত কাছাকাছি যে, বেশ বোঝা যায়।

আলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে মাদ্রাজ ফিরে গেল। আমরাও কুমারস্বামীর (কার্তিকের নাম—সুব্রহ্মণ্য, কুমারস্বামী ইত্যাদি; দক্ষিণ দেশে কার্তিকের ভারি পূজো, ভারি মান; কার্তিক ওঁ-কারের অবতার বলে) বাগানের নেবু, কতকগুলো ডাবের রাজা (কিং-কোকোনাট), দু-বোতল সরবৎ ইত্যাদি উপহার সহিত আবার জাহাজে উঠলাম।

মনসুন ঃ এডেন

আটাশ জুন প্রাতঃকাল জাহাজ কলম্বো ছাড়লো। এবার ভবা মনসুনের মধ্য দিয়ে গমন। জাহাজ যত এগিয়ে যাচ্চে, ঝড় ততই বাড়ছে, বাতাস ততই বিকট নিনাদ করছে—উভশ্রান্ত বৃষ্টি, অন্ধকার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গর্জে গর্জে জাহাজের উপর এসে পড়ছে; ডেকের উপর তিষ্ঠুন দায়। খাবার টেবিলের উপর আড়ে লম্বায় কাঠ দিয়ে চৌকো চৌকো খুবরি করে দিয়েছে, তার নাম 'ফিডল'। তার ওপর দিয়ে খাবার দাবার লাফিয়ে উঠছে। জাহাজ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করে উঠছে, যেন বা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কাপ্তেন বলছেন, 'তাইতো এবারকার মনসুনটা তো ভারি বিটকেল!' কাপ্তেনটি বেশ লোক; চীন ও ভারতবর্ষের নিকটবর্তী সমুদ্রে অনেক দিন কাটিয়েছেন; আমুদে লোক, আষাঢ়ে গল্প করতে ভারি মজবুত। কত রকম বোম্বেটের গল্প—চীনে কুলি জাহাজের অফিসারদের মেরে ফেলে কেমন করে জাহাজ শুদ্ধ লুটে নিয়ে পালাতো—এই রকম বহুৎ গল্প করছেন। আর কি করা যায়; লেখাপড়া এ দুলুনির চোটে মুশকিল। কেবিনের ভেতর বসা দায়; জানালাটা এঁটে দিয়েছে—ঢেউয়ের ভয়ে। একদিন তু-ভায়া একটু খুলে রেখেছিলেন, একটা ঢেউয়ের এক টুকরো এসে জলপ্লাবন করে গেল! উপরে সে ওছল-পাছলের ধুম কি! তারি ভেতরে তোমার 'উদ্বোধনে'র কাজ অল্প-স্বল্প চলছে মনে রেখো। জাহাজে দুই পাদ্রী উঠেছেন। একটি আমেরিকান—সস্ত্রীক, বড় ভাল মানুষ, নাম বোগেশ। বোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে, ছেলে-মেয়েতে ছটি সন্তান; চাকররা বলে, খোদার বিশেষ মেহেরবানি—ছেলেগুলোর সে অনুভব হয় না বোধ হয়। একখানা কাঁথা পেতে বোগেশ-ঘরনী ছেলেপিলেগুলিকে ডেকের উপর শুইয়ে চলে যায়। তারা নোংরা হয়ে কেঁদেকেটে গড়াগড়ি দেয়। যাত্রীরা সদাই সভয়। ডেকে বেড়াবার জো নেই; পাছে বোগেশের ছেলে মাড়িয়ে ফেলে। খুব ছোটটিকে একটি কানাতোলা চৌকো চুবড়িতে শুইয়ে, বোগেশ আর বোগেশের পাদ্রিনী জড়াজড়ি হয়ে কোণে চার ঘণ্টা বসে থাকে; তোমার ইওরোপীয় সভ্যতা বোঝা দায়। আমরা যদি বাইরে কুলকুচো করি, কি দাঁত মাজি—বলে কি

অসভ্য! আর জড়ামড়িগুলো গোপনে করলে ভাল হয় না কি? তোমরা আবার এই সভ্যতার নকল করতে যাও! যাহোক প্রোটেস্টান্ট ধর্মে উত্তর-ইওরোপের যে কি উপকার করেছে, তা পাদ্রী পুরুষ না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না। যদি এই দশ ক্রোর ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোরের সৃষ্টি!

জাহাজের টাল-মাটালে অনেকেরই মাথা ধরে উঠেছে। টুটল্ বলে একটি ছোট মেয়ে বাপের সঙ্গে যাচ্চে; তার মা নেই। আমাদের নিবেদিতা টুটলের ও বোগেশের ছেলেপিলের মা হয়ে বসেছে। টুটল্ বাপের কাছে মাইসোরে মানুষ হয়েছে। বাপ প্লান্টার। টুটল্‌কে জিজ্ঞাসা করলুম, 'টুটল্! কেমন আছ?' টুটল্ বললে, 'এ বাঙলাটা ভাল নয়, বড্ড দোলে, আর আমার অসুখ করে।' টুটলের কাছে ঘর দোর সব বাঙলা। বোগেশের একটি এঁড়ে-লাগা ছেলের বড় অযত্ন। বেচারা সারাদিন ডেকের কাঠের ওপর গড়িয়ে বেড়াচ্চে! বুড়ো কাপ্তেন মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চামচে করে সুরুয়া খাইয়ে যায় আর তার পা-টি দেখিয়ে বলে, 'কি রোগা ছেলে, কি অযত্ন!'

অনেকে অনন্ত সুখ চায়। সুখ অনন্ত হলে দুঃখও যে অনন্ত হত, তার কি? তাহলে কি আর আমরা এডেন পৌঁছুতুম। ভাগ্যিস সুখ দুঃখ কিছুই অনন্ত নয়, তাই ছয় দিনের পথ চৌদ্দ দিন করে দিনরাত বিষম ঝড়বাদলের মধ্যে দিয়েও শেষটা এডেনে পৌঁছে গেলুম। কলম্বো থেকে যত এগুনো যায়, ততই ঝড় বাড়ে, ততই আকাশ পুকুর, ততই বৃষ্টি, ততই বাতাসের জোর, ততই ঢেউ, সে বাতাস, সে ঢেউ ঠেলে কি জাহাজ চলে? জাহাজের গতি আদ্দেক হয়ে গেল—সকোত্রা দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে বেজায় বাড়লো। কাপ্তেন বললেন, 'এইখানটা মনসুনের কেন্দ্র; এইটা পেরুতে পারলেই ক্রমে ঠাণ্ডা সমুদ্র!' তাই হল। এই দুঃস্বপ্নও কাটলো।

৮ই সন্ধ্যাকালে এডেন। কাউকে নামতে দেবে না, কালা-গোরা মানে না। কোন জিনিস ওঠাতে দেবে না, দেখবার জিনিসও বড় নেই। কেবল ধুধু বালি, রাজপুতানার ভাব—বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়। পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে কেল্লা; ওপরে পল্টনের ব্যারাক। সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃতি হোটেল; আর দোকানগুলি জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলি জাহাজ দাঁড়িয়ে। একখানি ইংরেজী যুদ্ধজাহাজ, একখানি জার্মান এল; বাকিগুলি মালের বা

যাত্রীর জাহাজ। গেল বারে এডেন দেখা আছে। পাহাড়ের পেছনে দিশি পল্টনের ছাউনি, বাজার। সেখান থেকে মাইল কতক গিয়ে পাহাড়ের গায় বড় বড় গহ্বর তৈয়ারি করা, তাতে বৃষ্টির জল জমে। পূর্বে ঐ জলই ছিল ভরসা। এখন যন্ত্রযোগে সমুদ্রজল বাষ্প করে আবার জমিয়ে, পরিষ্কার জল হচ্ছে; তা কিন্তু মাগ্‌গি। এডেন ভারতবর্ষেরই একটি শহর যেন—দিশি ফৌজ, দিশি লোক অনেক। পারসী দোকানদার, সিন্ধি ব্যাপারী অনেক। এ এডেন বড় প্রাচীন স্থান—রোমান বাদশা কনস্টান্টিউস (Constantius) এখানে একদল পাদ্রী পাঠিয়ে ক্রিশ্চান ধর্ম প্রচার করান। পরে আরবেরা সে ক্রিশ্চানদের মেরে ফেলে। তাতে রোমি সুলতান প্রাচীন ক্রিশ্চান হাবসি দেশের বাদশাকে তাদের সাজা দিতে অনুরোধ করেন। হাবসি-রাজ ফৌজ পাঠিয়ে এডেনের আরবদের খুব সাজা দেন। পরে এডেন ইরানের সামানিডি বাদশাদের হাতে যায়। তাঁরাই নাকি প্রথমে জলের জন্য ঐ সকল গহ্বর খোদান। তারপর মুসলমান ধর্মের অভ্যুদয়ের পর এডেন আরবদের হাতে যায়। কতক কাল পরে পোর্তুগিজ সেনাপতি ঐ স্থান দখলের বৃথা উদ্যম করেন। পরে তুরস্কের সুলতান ঐ স্থানকে— পোর্তুগিজদের ভারত মহাসাগর হতে তাড়াবার জন্য—দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের বন্দর করেন।

আবার উহা নিকটবর্তী আরব-মালিকের অধিকারে যায়। পরে ইংরেজরা ক্রয় করে বর্তমান এডেন করেছেন। এখন প্রত্যেক শক্তিমান জাতির যুদ্ধপোতনিচয় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্চে। কোথায় কি গোলযোগ হচ্চে, তাতে সকলেই দু-কথা কইতে চায়। নিজেদের প্রাধান্য, স্বার্থ, বাণিজ্য রক্ষা করতে চায়। কাজেই মাঝে মাঝে কয়লার দরকার। পরের জায়গায় কয়লা লওয়া যুদ্ধকালে চলবে না বলে আপন আপন কয়লা নেওয়ার স্থান করতে চায়। ভাল ভালগুলি ইংরেজ তো নিয়ে বসেছেন; তারপর ফ্রান্স, তারপর যে যেথায় পায়—কেড়ে, কিনে, খোশামোদ করে—এক একটা জায়গা করেছে এবং করছে। সুয়েজ খাল হচ্চে এখন ইওরোপ-আশিয়ার সংযোগ স্থান। সেটা ফরাসীদের হাতে। কাজেই ইংরেজ এডেনে খুব চেপে বসেছে, আর অন্যান্য জাতও রেড-সীর ধারে ধারে এক একটা জায়গা করেছে। কখনও বা জায়গা নিয়ে উলটো উৎপাত হয়ে বসে। সাত-শ বৎসবের পর-পদদলিত ইতালি কত কষ্টে পায়েব উপর খাড়া হল, হয়েই ভাবলে— কি হলুম রে! এখন দিগ্বিজয় কবতে হবে। ইওরোপের এক টুকখোও কাবও নেবার জো নাই; সকলে

মিলে তাকে মারবে! আশিয়ায় বড় বড় বাঘা-ভাল্‌কো—ইংরেজ, রুশ, ফ্রেঞ্চ, ডচ—এরা আর কি কিছু রেখেছে? এখন বাকি আছে দু-চার টুকরো আফ্রিকার। ইতালি সেই দিকে চলল। প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় চেষ্টা করলে। সেথায় ফ্রান্সের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এল। তারপর ইংরেজরা রেড-সীর ধারে একটা জমি দান করলে। মতলব —সেই কেন্দ্র হতে ইতালি হাবসিরাজ্য উদরসাৎ করেন। ইতালিও সৈন্যসামন্ত নিয়ে এগুলেন। কিন্তু হাবসি বাদশা মেনেলিক এমনি গো-বেড়েন দিলে যে, এখন ইতালির আফ্রিকা ছেড়ে প্রাণবাঁচানো দায় হয়েছে। আবার রুশের ক্রিশ্চানি এবং হাবসির ক্রিশ্চানি নাকি এক রকমের —তাই রুশের বাদশা ভেতরে ভেতরে হাবসিদের সহায়।

রেড-সী

জাহাজ তো রেড-সীর মধ্য দিয়ে যাচ্চে। পাদ্রী বললেন, 'এই—এই রেড-সী, ইহুদী-নেতা মুসা সদলবলে পদব্রজে পার হয়েছিলেন। আর তাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে মিসরি বাদশা 'ফেরৌ' যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন, তারা কাদায় রথচক্র ডুবে—কর্ণের মতো আটকে—জলে ডুবে মারা গেল।' পাদ্রী আরও বললেন যে, এ-কথা এখন আধুনিক বিজ্ঞান -যুক্তির দ্বারা প্রমাণ হতে পারে। এখন সব দেশে ধর্মের আজগুবীগুলি বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার এক ঢেউ উঠেছে। মিঞা! যদি প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ সবগুলি হয়ে থাকে তো আর তোমার য়াভে-দেবতা মাঝখান থেকে আসেন কেন? বড়ই মুশকিল! যদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হয় তো ও-কেরামতগুলি আজগুবী এবং তোমার ধর্ম মিথ্যা। যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহলেও তোমার দেবতার মহিমাটি বাড়ার ভাগ, ও আর সব প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় আপনা-আপনি হয়েছে। পাদ্রী বোগেশ বললে, 'আমি অত শত জানিনি, আমি বিশ্বাস করি।' এ-কথা মন্দ নয়—এ সহ্যি হয়। তবে ঐ যে একদল আছে—পরের বেলা দোষটি দেখাতে, যুক্তিটি আনতে কেমন তৈয়ার; নিজের বেলায় বলে, 'আমি বিশ্বাস করি, আমার মন সাক্ষ্য দেয়' —তাদের কথাগুলো একদম অসহ্য। আ মরি!—ওঁদের আবার মন! ছটাকও নয়, আবার মণ! পরের বেলা সব কুসংস্কার, বিশেষ যেগুলো সাহেবে বলেছে; আর নিজে একটা কিম্ভূত-কিমাকার কল্পনা করে কেঁদেই অস্থির!!

জাহাজ ক্রমেই উত্তরে চলেছে। এই রেড-সীর কিনার—প্রাচীন সভ্যতার এক মহাকেন্দ্র। ঐ—ওপারে আরবের মরুভূমি; এপারে—মিসর। এই—সেই প্রাচীন মিসর; এই মিসরিরা পন্‌ট্ দেশ (সম্ভবতঃ মালাবার) হতে রেড-সী পার হয়ে, কত হাজার বৎসর আগে, ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার করে উত্তরে পৌঁছেছিল। এদের আশ্চর্য শক্তিবিস্তার, রাজ্যবিস্তার, সভ্যতাবিস্তার। যবনেরা এদের শিষ্য। এদের বাদশাদের পিরামিড নামক আশ্চর্য সমাধিমন্দির, নারীসিংহী মূর্তি। এদের মৃত দেহগুলি পর্যন্ত আজও বিদ্যমান। বাবরি-কাটা চুল; কাছাহীন ধপ্‌ধপে ধুতি পরা, কানে কুণ্ডল, মিসরি লোক সব, এই দেশে

বাস করত। এই—হিক্‌স বংশ, ফেরো বংশ, ইরানী বাদশাহি, সিকন্দর, টলেমি বংশ এবং রোমক ও আরব বীরদের রঙ্গভূমি— মিসর। সেই ততকাল আগে এরা আপনাদের বৃত্তান্ত পাপিরস্‌ পত্রে, পাথরে, মাটির বাসনের গায়ে চিত্রাক্ষরে তন্ন তন্ন করে লিখে গেছে।

এই ভূমিতে আইসিসের পূজা, হোরসের প্রাদুর্ভাব। এই প্রাচীন মিসরিদের মতে—মানুষ মলে তার সূক্ষ্ম শরীর বেড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু মৃতদেহের কোন অনিষ্ট হলেই সূক্ষ্ম শরীরে আঘাত লাগে, আর মৃতশরীরের ধ্বংস হলেই সূক্ষ্ম শরীরের একান্ত নাশ, তাই শরীর রাখবার এত যত্ন। তাই রাজা-বাদশাদের পিরামিড। কত কৌশল! কি পরিশ্রম! সবই আহা বিফল!! ঐ পিরামিড খুঁড়ে, নানা কৌশলে রাস্তার রহস্য ভেদ করে রত্নলোভে দস্যুরা সে রাজ-শরীর চুরি করেছে। আজ নয়, প্রাচীন মিসরিরা নিজেরাই করেছে। পাঁচ সাত-শ বৎসর আগে এই সকল শুকনো মরা—ইহুদি ও আরব ডাক্তারেরা মহৌষধি-জ্ঞানে ইউরোপ-সুদ্ধ রোগীকে খাওয়াত। এখনও উহা বোধ হয় ইউনানি হাকিমির আসল 'মামিয়া' !!

/এই মিসরে টলেমি বাদশার সময়ে সম্রাট ধর্মাশোক ধর্মপ্রচারক পাঠান। তারা ধর্ম প্রচার করত, রোগ ভাল করত, নিরামিশ খেত, বিবাহ করত না, সন্ন্যাসী শিষ্য করত। তারা নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলে— থেরাপিউট, অসসিনি, মানিকি ইত্যাদি—যা হতে বর্তমান ক্রিশ্চানি ধর্মের সমুদ্ভব।/ এই মিসরই টলেমিদের রাজত্বকালে সর্ববিদ্যার আকর হয়ে উঠেছিল। এই মিসরেই সে আলেকজেন্দ্রিয়া নগর, যেখানকার বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, বিদ্বজ্জন জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। সে আলেকজেন্দ্রিয়া মূর্খ গোঁড়া ইতর ক্রিশ্চানদের হাতে পড় ধ্বংস হয়ে গেল—পুস্তকালয় ভস্মরাশি হল— বিদ্যার সর্বনাশ হল। শেষ বিদুষী নারীকে[১] ক্রিশ্চানেরা নিহত করে, তাঁর নগ্নদেহ রাস্তায় রাস্তায় সকল প্রকার বীভৎস অপমান করে টেনে বেড়িয়ে, অস্থি হতে টুকরা টুকরা মাংস আলাদা করে ফেলেছিল!

আর দক্ষিণে—বীরপ্রসূ আরবের মরুভূমি। কখন আলখাল্লা-ঝোলানো —পশমের গোছা দড়ি দিয়ে একখানা মস্ত রুমাল মাথায় আঁটা—বদ্দু আরব

১ হাইপেশিয়া (Hypatia)

দেখেছ?—সে চলন, সে দাঁড়াবার ভঙ্গি, সে চাউনি, আর কোনও দেশে নাই। আপাদমস্তক দিয়ে মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়ার স্বাধীনতা ফুটে বেরুচ্চে—সেই আরব। যখন ক্রিশ্চানদের গোঁড়ামি আর গথদের বর্বরতা প্রাচীন ইউনান[২] ও রোমান সভ্যতালোককে নির্বাণ করে দিলে, যখন ইরান অন্তরের পূতিগন্ধ ক্রমাগত সোনার পাত দিয়ে মোড়বার চেষ্টা করছিল, যখন ভারতে—পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনীর গৌরবরবি অস্তাচলে, উপরে মূর্খ ক্রূর রাজবর্গ, ভিতরে ভীষণ অশ্লীলতা ও কামপূজার আবর্জনারাশি—সেই সময়ে এই নগণ্য পশুপ্রায় আরবজাতি বিদ্যুদ্বেগে ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

ঐ স্টীমার মক্কা হতে আসছে—যাত্রী ভরা; ঐ দেখ—ইওরোপী পোশাকপরা তুর্ক, আধা ইওরোপীবেশে মিসরি, ঐ সুরিয়াবাসী মুসলমান ইরানীবেশে, আর ঐ আসল আরব ধুতিপরা—কাছা নেই। মহম্মদের পূর্বে কাবার মন্দিরে উলঙ্গ হয়ে প্রদক্ষিণ করতে হত; তাঁর সময় থেকে একটা ধুতি জড়াতে হয়; তাই আমাদের মুসলমানেরা নমাজের সময় ইজারের দড়ি খোলে, ধুতির কাছা খুলে দেয়। আর আরবদের সেকাল নেই। ক্রমাগত কাফ্রি, সিদি, হাবসি রক্ত প্রবেশ করে চেহারা উদ্যম—সব বদলে গেছে, মরুভূমির আরব পুনর্মূষিক হয়েছেন। যারা উত্তরে, তারা তুরস্কের রাজ্যে বাস করে—চুপচাপ করে। কিন্তু সুলতানের ক্রিশ্চান প্রজারা তুরস্ককে ঘৃণা করে, আরবকে ভালবাসে, 'আরবরা লেখাপড়া শেখে, ভদ্রলোক হয়, অত উৎপেতে নয়'—তারা বলে। আর খাঁটি তুর্করা ক্রিশ্চানদের উপর বড়ই অত্যাচার করে।

মরুভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হলেও সে গরম দুর্বল করে না। তাতে কাপড়ে গা-মাথা ঢেকে রাখলেই আর গোল নেই। শুষ্ক গরমি—দুর্বল তো করেই না, বরং বিশেষ বলকারক। রাজপুতানার, আরবের, আফ্রিকার লোকগুলি এর নিদর্শন। মারোয়াড়ের এক এক জেলায় মানুষ, গরু, ঘোড়া—সবই সবল ও আকারে বৃহৎ। আরবী মানুষ ও সিদিদের দেখলে আনন্দ হয়। যেখানে জোলো গরমি, যেমন বাঙলা দেশ, সেখানে শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, আর সব দুর্বল।

রেড-সীর নামে যাত্রীদের হৃৎকম্প হয়—ভয়ানক গরম, তাই এই গরমি

---

২ যবন, গ্রীক

কাল। ডেকে বসে যে যেমন পারছে, একটা ভীষণ দুর্ঘটনার গল্প শোনাচ্চে। কাপ্তেন সকলের চেয়ে উঁচিয়ে বলছেন। তিনি বললেন, 'দিন কতক আগে একখানা চীনি যুদ্ধজাহাজ এই রেড-সী দিয়ে যাচ্ছিল, তার কাপ্তেন ও আটজন কয়লাওয়ালা খালাসি গরমে মরে গেছে।'

বাস্তবিক কয়লাওয়ালা—একে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তায় রেড-সীর নিদারুণ গরম। কখন কখন খেপে ওপরে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে, আর ডুবে মরে; কখনও বা গরমে নিচেই মারা যায়।

এই সকল গল্প শুনে হৃৎকম্প হবার তো যোগাড়। কিন্তু অদৃষ্ট ভাল, আমরা বিশেষ গরম কিছুই পেলুম না। হাওয়া দক্ষিণী না হয়ে উত্তর থেকে আসতে লাগল—সে ভূমধ্যসাগরের ঠাণ্ডা হাওয়া।

সুয়েজখালে ঃ হাঙ্গর শিকার

১৪ জুলাই রেড-সী পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌছুল। সামনে—সুয়েজ খাল। জাহাজে—সুয়েজে নাবাবার মাল আছে। তার উপর এসেছেন মিসরে প্লেগ, আর আমরা আনছি প্লেগ সম্ভবতঃ—কাজেই দোতরফা ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়। এ ছুঁৎছাঁতের ন্যাটার কাছে আমাদের দিশি ছুঁৎছাঁত কোথায় লাগে! মাল নাববে, কিন্তু সুয়েজের কুলি জাহাজ ছুঁতে পারবে না। জাহাজে খালাসী বেচারাদের আপদ আর কি! তারাই কুলি হয়ে ক্রেনে করে মাল তুলে, আলটপ্‌কা নিচে সুয়েজী নৌকায় ফেলছে—তারা নিয়ে ডাঙায় যাচ্চে। কোম্পানির এজেন্ট ছোট লঞ্চে করে জাহাজের কাছে এসেছেন, ওঠবার হুকুম নেই। কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজে নৌকায় কথা হচ্চে। এ তো ভারতবর্ষ নয় যে, গোরা আদমী প্লেগ আইন-ফাইন সকলের পার—এখানে ইওরোপের আরম্ভ। স্বর্গে ইঁদুর-বাহন প্লেগ পাছে ওঠে, তাই এত আয়োজন। প্লেগ-বিষ—প্রবেশ থেকে দশ দিনের মধ্যে ফুটে বেরোন; তাই দশ দিনের আটক। আমাদের কিন্তু দশ দিন হয়ে গেছে—ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু মিসরি আদমীকে ছুঁলেই আবার দশ দিন আটক—তাহলে আর নেপল্‌সেও লোক নাবানো হবে না, মার্সাইতেও নয়; কাজেই যা কিছু কাজ হচ্চে, সব আলগোছে; কাজেই ধীরে ধীরে মাল নাবাতে সারাদিন লাগবে। রাত্রিতে জাহাজ অনায়াসেই খাল পার হতে পারে, যদি সামনে বিজলী-আলো পায়; কিন্তু সে আলো পরাতে গেলে, সুয়েজের লোককে জাহাজ ছুঁতে হবে, বস্—দশ দিন কাঁরাটিন (quarantine)। কাজেই রাতেও যাওয়া হবে না, চব্বিশ ঘণ্টা এইখানে পড়ে থাকো—সুয়েজ বন্দরে।

এটি বড় সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিন দিকে বালির ঢিপি আর পাহাড়—জলও খুব গভীর। জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। এই বন্দরে আর অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি বন্দরে যত হাঙ্গর, এমন আর দুনিয়ার কোথাও নাই—বাগে পেলেই মানুষকে খেয়েছে। জলে নাবে কে? সাপ আর হাঙ্গরের ওপর মানুষেরও জাতক্রোধ; মানুষও বাগে পেলে ওদের ছাড়ে না।

সকাল বেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড়

বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। জল-জ্যান্ত হাঙ্গর পূর্বে আর কখন দেখা যায়নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তা-ও আবার শহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড ক্লাশটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ঝুঁকে হাঙ্গর দেখছে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর-মিঞারা একটু সরে গেছেন; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙ্ ধাড়ার মতো এক প্রকার মাছ্ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসছে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ জলে থিক্ থিক্ করছে। মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিস মাছের চেহারা, তীরের মতো এদিক ওদিক করে দৌড়ুচ্চে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙ্গরের বাচ্চা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়, ওঁর নাম বনিটো। পূর্বে ওঁর বিষয় পড়া গেছলো বটে; এবং ম্যালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানি হন হুড়ি চড়ে—তাও পড়া ছিল। ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুশি হওয়া গেল। অত বড় মাছটা তীরের মতো জলের ভিতর ছুটছে, আর সে সমুদ্রের কাচের মতো জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখা যাচ্চে। বিশ মিনিট, আধঘণ্টা-টাক, এই প্রকার বনিটোর ছুটাছুটি আর ছোট মাছের কিলিবিলি তো দেখা যাচ্চে। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার—ক্রমে তিতিবিরক্ত হয়ে আসছি, এমন সময়ে একজন বললে—ঐ ঐ! দশ বার জন বলে উঠল—ঐ আসছে, ঐ আসছে!! চেয়ে দেখি, দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো বস্তু ভেসে আসছে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নিচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগলো। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে; সে গদাইলস্করি চাল, বনিটোর সোঁ সোঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আসছে—আর আগে আগে দু-একটা ছোট মাছ; আর কতকগুলো ছোট মাছ তার পিঠে গায়ে পেটে খেলে বেড়াচ্চে। কোন কোনটা বা জেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বসছে। ইনি সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙ্গর। যে মাছগুলি হাঙ্গরের আগে আগে যাচ্চে, তাদের নাম 'আড়কাটী মাছ—পাইলট ফিস্'। তারা হাঙ্গরকে শিকার দেখিয়ে দেয় আর বোধ হয় প্রসাদটা-আসটা পায়। কিন্তু হাঙ্গরের সে মুখ-ব্যাদান দেখলে তারা যে বেশি সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশেপাশে ঘুরছে, পিঠে চড়ে বসছে, তারা হাঙ্গর-'চোষক'। তাদের বুকের

কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া চেপটা গোলপানা একটি স্থান আছে। তার মাঝে, যেমন ইংরেজি অনেক রবারের জুতোর তলায় লম্বা লম্বা জুলি-কাটা কিরকিরে থাকে, তেমনি জুলি-কাটাকাটা। সেই জায়গাটা ঐ মাছ, হাঙ্গরের গায়ে দিয়ে চিপসে ধরে; তাই হাঙ্গরের গায়ে পিঠে চড়ে চলছে দেখায়। এরা নাকি হাঙ্গরের গায়ের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচে। এই দুইপ্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হয়ে হাঙ্গর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায়-পরিষদ জ্ঞানে কিছু বলেনও না। এই মাছ একটা ছোট হাতসুতোয় ধরা পড়ল। তার বুকে জুতোর তলা একটু চেপে দিয়ে পা তুলতেই সেটা পায়ের সঙ্গে চিপসে উঠতে লাগলো; ঐ রকম করে সে হাঙ্গরের গায়ে লেগে যায়।

সেকেণ্ড কেলাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক—তার তো উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়শির যোগাড় করলে, সে 'কুয়োর ঘটি তোলার' ঠাকুরদাদা। তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত চার বাদ দিয়ে, একখানা মস্ত কাঠ ফাতনার জন্য লাগানো হল। তারপর ফাতনা-সুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ করে জলে ফেলে দেওয়া হল। জাহাজের নিচে একখানা পুলিসের নৌকা—আমরা আসা পর্যন্ত চৌকি দিচ্ছিল, পাছে ডাঙার সঙ্গে আমাদের কোন রকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হয়ে উঠল। হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে কোমর আঁটবার যোগাড় করছেন, এমন সময় বুঝতে পারলেন যে অত হাঁকাহাঁকি, কেবল তাঁকে— কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙ্গর ধরবার ফাতনাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে দেবার অনুরোধ-ধ্বনি। তখন তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে একটা বল্লির ডগায় করে ঠেলেঠুলে ফাতনাটাকে তো দূরে ফেললেন; আর আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো—অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো'। কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দু-শ হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মসকের আকার কি একটা ভেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে 'ঐ হাঙ্গর, ঐ

হাঙ্গর' রব। 'চুপ্‌চুপ্—ছেলের দল! হাঙ্গর পালাবে।' 'বলি, ওহে! সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙ্গরটা যে ভড়কে যাবে'—ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে, তাবৎ সেই হাঙ্গর লবণসমুদ্রজন্মা, বঁড়শিসংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্য, পালভরে নৌকার মতো সোঁ করে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত—এইবার হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকেছে। সে ভীম পুচ্ছ একটু হেললো—সোজা গতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ, হাঙ্গর চলে গেল যে হে! আবার পুচ্ছ একটু বাঁকলো, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বঁড়শিমুখো দাঁড়ালো। আবার সোঁ করে আসছে—ঐ হাঁ করে বঁড়শি ধরে ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়ল, আর হাঙ্গর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চলল। আবার ঐ চক্র দিয়ে আসছে, আবার হাঁ করছে; ঐ—ঐ টোপটা মুখে নিয়েছে, এইবার—ঐ ঐ চিতিয়ে পড়ল; হয়েছে, টোপ খেয়েছে—টান্ টান্ টান্, ৪০/৫০ জনে টান, প্রাণপণে টান। কি জোর মাছের! কি ঝটাপট—কি হাঁ। টান্ টান্। জল থেকে এই উঠল, ঐ যে জলে ঘুরছে, আবার চিতুচ্চে, টান্ টান্। যাঃ, টোপ খুলে গেল! হাঙ্গর পালাল! তাই তো হে, তোমাদের কি তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে! যেই চিতিয়েছে অমনি কি টানতে হয়? আর—'গতস্য শোচনা নাস্তি'; হাঙ্গর তো বঁড়শি ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড়। আড়কাটী মাছকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কিনা তা খবর পাইনি, মোদ্দা—হাঙ্গর তো চোঁচা। আবার সেটা ছিল 'বাঘা'—বাঘের মতো কালো কালো ডোরা কাটা। যা হোক্ 'বাঘা' বঁড়শি-সন্নিধি পরিত্যাগ করবার জন্য, স-'আড়কাটী'-'রক্তচোষা' অন্তর্দধে।

কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই—ঐ যে পলায়মান 'বাঘার' গা ঘেঁষে আব একটা প্রকাণ্ড 'থ্যাবড়ামুখো' চলে আসছে! আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই! নইলে 'বাঘা' নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিত। নিশ্চিত বলত, 'দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গরগিরি করছি, কত রকম জানোয়ার—জ্যান্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেছি কত রকম হাড়-গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-কুটরো পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম!! এই দেখ না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েছে'—বলে একবার সেই আকটিদেশ- বিস্তৃত মুখ ব্যাদান করে আগন্তুক হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীনবয়সসুলভ অভিজ্ঞতা

সহকারে—চ্যাঙ-মাছের পিত্তি, কুঁজো-ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোন-না-কোনটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না, তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না। (অতএব যতদিন না কোন প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্চে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন করে হয়?—অথবা 'বাঘা' মানুষ-ঘেঁষা হয়ে মানুষের ধাত পেয়েছে, তাই 'থ্যাবড়া'কে আসল খবর কিছু না বলে মুচকে হেসে, 'ভাল আছ তো হে' বলে সরে গেল।—'আমি একাই ঠকবো?')

'আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা.....'—শঙ্খধ্বনি তো শোনা যায় মা, কিন্তু আগে আগে চলেছেন 'পাইলট ফিস্', আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাব্ড়া'; তাঁর আশেপাশে নেত্য করছেন 'হাঙ্গর-চোষা' মাছ। আহা ও লোভ কি ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্‌ঝিক্ করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কত দূর ছুটেছে, তা 'থ্যাব্ড়াই' বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—সাদা, লাল, জরদা—এক জায়গায়। আসল ইংরেজি শূয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্চে!

এবার সব চুপ্—নোড়ো চোড়ো না, আর দেখ—তাড়াতাড়ি করো না। মোদ্দা—কাছির কাছে থেকো। ঐ, বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে! দেখুক। চুপ্ চুপ্—এইবার চিৎ হল—ঐ যে আড়ে গিলছে; চুপ্—গিলতে দাও। তখন 'থ্যাব্ড়া' অবসরক্রমে আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ করে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়ল টান! বিস্মিত 'থ্যাব্ড়া' মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উলটো উৎপত্তি!! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান—কাছি ধরে দে টান। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠল—টান্ ভাই টান্! ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের ওপর! বাপ্ কি মুখ! ও যে সবটাই মুখ আর গলা হে! টান্—ঐ সবটা জল ছাড়িয়েছে। ঐ যে বঁড়শিটা বিঁধেছে— ঠোঁট এফোঁড় ওফোঁড়—টান্। থাম্ থাম্—ও আরব পুলিস-মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও তো—নইলে যে এত বড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও-ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যায়। আবার

টান্—কি ভারি হে? ও মা, ও কি? তাই তো হে, হাঙ্গরের পেটের নিচে দিয়ে ও ঝুলছে কি? ও যে—নাড়ি-ভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরুল যে! যাক্, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক; টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্—এই এল। এইবার জাহাজের ওপর ফেলো; ভাই হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড়—ধুপ্। বাবা, কি হাঙ্গর! কি ধপাৎ করেই জাহাজের ওপর পড়ল! সাবধানের মার নেই—ঐ কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মারো। ওহে ফৌজি-ম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ।—'বটে তো'। রক্ত-মাখা গায-কাপড়ে ফৌজি যাত্রী কড়িকাঠ উঠিয়ে দুম্ দুম্ দিতে লাগলো হাঙ্গরের মাথায়, আর মেয়েরা—'আহা কি নিষ্ঠুর! মেরো না' ইত্যাদি চিৎকার করতে লাগলো— অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এইখানেই বিরাম হোক। কেমন করে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন-অন্ত্র ভিন্ন দেহ ছিন্নহৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নডতে লাগলো; কেমন করে তাব পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাট-কুটরো এক রাশ বেরুলো—সে সব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়া-দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগলো।

এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফার্ডিনেণ্ড লেসেপ্স নামক এক ফরাসী স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগরের সংযোগ হয়ে ইওরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। মানব-জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতেব বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদিকাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্যশিল্পে ভারতের মতো দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এদেশের মতো কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান—ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই

যে দেশ যখন সভ্য হত তখন ঐ সকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর। (এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চলত; একটি ডাঙাপথে আফগানি ইরানী দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে রেড-সী হয়ে। সিকন্দর শাহ্ ইরান-বিজয়ের পর নিয়ার্কুস নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিত সমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখতে পাঠান। বাবিল ইরান গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত, তা অনেকে জানে না।) রোম-ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস ও জেনোয়া ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল করে ইতালীয়দের ভারত-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, তখন জেনোয়াবাসী কলম্বাস (Christophoro Columbo) আটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল— আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বাসের ভ্রম যায়নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেইজন্যই আমেরিকার আদিম নিবাসীবা এখনও 'ইণ্ডিযান' নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধুনদের 'সিন্ধু' 'ইন্দু' দুই নামই পাওয়া যায়; ইরানীরা তাকে 'হিন্দু', গ্রীকরা 'ইণ্ডুস' করে তুললে; তাই থেকে ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্মের অভ্যুদয়ে 'হিন্দু' দাঁড়ালো—কালা (খারাপ), যেমন এখন—'নেটিভ'।

এদিকে পোর্তুগিজেরা ভারতের নূতন পথ—আফ্রিকা বেড়ে আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্তুগালের উপর সদযা হলেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য, রাজস্ব—সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের ওপর বড় জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিসপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। এ কথা ইওরোপীয়রা স্বীকার করতে চায না; ভারত—নেটিভপূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না। আমরা বোঝাতে কি ছাড়বো? ভেবে দেখ—কথাটা কি। ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতি-বিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও

তারা পাচ্চে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্চে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলটপালট হয়ে যাচ্চে।

হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলকজন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি—কে ভাবে এ কথা। স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে, আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরিবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্চে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি!—তোমাদের প্রণাম করি।

এ সুয়েজ খালও অতি প্রাচীন জিনিস। প্রাচীন মিসরের ফেরো বাদশাহের সময় কতকগুলি লবণাম্বু জলা খাতের দ্বারা সংযুক্ত করে উভয়-সমুদ্রস্পর্শী এক খাত তৈয়ার হয়। মিসরে রোমরাজ্যের শাসনকালেও মধ্যে মধ্যে ঐ খাত মুক্ত রাখবার চেষ্টা হয়। পরে মুসলমান সেনাপতি অমরু মিসর বিজয় করে ঐ খাতের বালুকা উদ্ধার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদলে একপ্রকার নূতন করে তোলেন।

তারপর বড় কেউ কিছু করেননি। তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি, মিসরখেদিব ইস্মায়েল ফরাসীদের পরামর্শে অধিকাংশ ফরাসী অর্থে এই খাত খনন করান। এ খালের মুশকিল হচ্চে যে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবার দরুন পুনঃপুনঃ বালিতে ভরে যায়। এই খাতের মধ্যে বড় বাণিজ্য-জাহাজ একখানি একবারে যেতে পারে। শুনেছি যে, অতি বৃহৎ রণতরী বা বাণিজ্য-জাহাজ একেবারেই

যেতে পারে না। এখন একখানি জাহাজ যাচ্চে আর একখানি আসছে, এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে—এই জন্যে সমস্ত খালটি কতগুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ভাগের দুই মুখে কতকটা স্থান এমন ভাবে প্রশস্ত করে দেওয়া আছে, যাতে দুই-তিনখানি জাহাজ একত্র থাকতে পারে। ভূমধ্যসাগরমুখে প্রধান আফিস, আর প্রত্যেক বিভাগেই রেল স্টেশনের মতো স্টেশন। সেই প্রধান আফিসে জাহাজটি খালে প্রবেশ করবামাত্রই ক্রমাগত তারে খবর যেতে থাকে। কখানি আসছে, কখানি যাচ্চে এবং প্রতি মুহূর্তে তারা কে কোথায়—তা খবর যাচ্চে এবং একটি বড় নকশার উপর চিহ্নিত হচ্চে। একখানির সামনে যদি আর একখানি আসে, এজন্য এক স্টেশনের হুকুম না পেলে আব এক স্টেশন পর্যন্ত জাহাজ যেতে পায না।

এই সুয়েজ খাল ফরাসীদেব হাতে। যদিও খাল-কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার এখন ইংরেজদের, তথাপি সমস্ত কার্য ফরাসীরা করে—এটি বাজনৈতিক মীমাংসা।

ভূমধ্যসাগর

এবার ভূমধ্যসাগর। ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই—এশিয়া, আফ্রিকা—প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতি নীতি, খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর এক প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি, আহার-বিহার, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার আরম্ভ হল—ইওরোপ এল। শুধু তাই নয়—নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্দীব্যাপী যে মহা-সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইখানে। যে ধর্ম, যে বিদ্যা, যে সভ্যতা, যে মহাবীর্য আজ ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, এই ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বই তার জন্মভূমি। ঐ দক্ষিণে—ভাস্কর্যবিদ্যার আকর, বহুধনধান্যপ্রসূ অতি প্রাচীন মিসর; পূর্বে ফিনিসিয়ান, ফিলিস্টিন, ইহুদী, মহাবল বাবিল, আসির ও ইরানী সভ্যতার প্রাচীন রঙ্গভূমি—এশিয়া মাইনর; উত্তরে—সর্বাশ্চর্যময় গ্রীকজাতির প্রাচীন লীলাক্ষেত্র।

স্বামীজী! দেশ নদী পাহাড় সমুদ্রের কথা তো অনেক শুনলে, এখন প্রাচীন কাহিনী কিছু শোন। এ প্রাচীন কাহিনী বড় অদ্ভুত। গল্প নয়—সত্য; মানবজাতির যথার্থ ইতিহাস। এই সকল প্রাচীন দেশ কালসাগরে প্রায় লয় হয়েছিল। যা কিছু লোকে জানত, তা প্রায় প্রাচীন যবন ঐতিহাসিকের অদ্ভুত গল্পপূর্ণ প্রবন্ধ অথবা বাইবেল-নামক ইহুদী পুরাণের অত্যদ্ভুত বর্ণনা মাত্র। এখন পুরানো পাথর, বাড়ি, ঘর, টালিতে লেখা পুঁথি, আর ভাষাবিশ্লেষ শত মুখে গল্প করছে। এ গল্প এখন সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনই কত আশ্চর্য কথা বেরিয়ে পড়েছে, পরে কি বেরুবে কে জানে? দেশ-দেশান্তরের মহা মহা পণ্ডিত দিনরাত এক টুকরো শিলালেখ বা ভাঙা বাসন বা একটা বাড়ি বা একখান টালি নিয়ে মাথা ঘামাচ্চেন, আর সেকালের লুপ্ত বার্তা বার করছেন।

যখন মুসলমান নেতা ওসমান কনস্টান্টিনোপল দখল করলে, সমস্ত পূর্ব ইওরোপে ইসলামের ধ্বজা সগর্বে উড়তে লাগলো, তখন প্রাচীন গ্রীকদের যে সকল পুস্তক, বিদ্যাবুদ্ধি তাদের নির্বীর্য বংশধরদের কাছে লুকানো ছিল, তা পশ্চিম ইওরোপে পলায়মান গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রীকেরা রোমের বহুকাল পদানত হয়েও বিদ্যাবুদ্ধিতে রোমকদের গুরু ছিল। এমন

কি, গ্রীকরা ক্রিশ্চান হওয়ায় এবং গ্রীক ভাষায় ক্রিশ্চানদের ধর্মগ্রন্থ লিখিত হওয়ায় সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে ক্রিশ্চানধর্মের বিজয় হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক, যাদের আমরা যবন বলি, যারা ইওরোপী সভ্যতার আদ্‌গুরু, তাদের সভ্যতার চরম উত্থান ক্রিশ্চানদের অনেক পূর্বে। ক্রিশ্চান হয়ে পর্যন্ত তাদের বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত লোপ পেয়ে গেল, কিন্তু যেমন হিন্দুদের ঘরে পূর্বপুরুষদের বিদ্যাবুদ্ধি কিছু কিছু রক্ষিত আছে, তেমনি ক্রিশ্চান গ্রীকদের কাছে ছিল; সেই সকল পুস্তক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাতেই ইংরেজ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ। গ্রীকভাষা, গ্রীকবিদ্যা শেখবার একটা ধুম পড়ে গেল। প্রথমে যা কিছু ঐ সকল পুস্তকে ছিল, তা হাড়সুদ্ধ গেলা হল। তারপর যখন নিজেদের বুদ্ধি মার্জিত হয়ে আসতে লাগলো এবং ক্রমে ক্রমে পদার্থ-বিদ্যার অভ্যুত্থান হতে লাগলো তখন ঐ সকল গ্রন্থের সময়, প্রণেতা, বিষয়, যাথাতথ্য ইত্যাদির গবেষণা চলতে লাগলো। ক্রিশ্চানদের ধর্মগ্রন্থগুলি ছাড়া প্রাচীন অ-ক্রিশ্চান গ্রীকদের সমস্ত গ্রন্থের উপর মতামত প্রকাশ করতে তো আর কোন বাধা ছিল না, কাজেই বাহ্য এবং আভ্যন্তর সমালোচনার এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়ল।

মনে কর, একখানা পুস্তকে লিখেছে যে অমুক সময় অমুক ঘটনা ঘটেছিল। কেউ দয়া করে একটা পুস্তকে যা হয় লিখেছেন বললেই কি সেটা সত্য হল? লোকে, বিশেষ সে কালের, অনেক কথাই কল্পনা থেকে লিখত। আবার প্রকৃতি, এমন কি, আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অল্প ছিল; এই সকল কারণে গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সত্যাসত্যের নির্ধারণে বিষম সন্দেহ জন্মাতে লাগলো।

প্রথম উপায়—মনে কর, একজন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, অমুক সময়ে ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত বলে একজন রাজা ছিলেন। যদি ভারতবর্ষের গ্রন্থেও ঐ সময়ে ঐ রাজার উল্লেখ দেখা যায়, তাহলে বিষয়টা অনেক প্রমাণ হল বইকি। যদি চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলো টাকা পাওয়া যায় বা তাঁর সময়ের একটা বাড়ি পাওয়া যায়, যাতে তাঁর উল্লেখ আছে, তাহলে আর কোন গোলই রইল না।

দ্বিতীয় উপায়—মনে কর, আবার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে একটা ঘটনা সিকন্দর বাদশার সময়ের, কিন্তু তার মধ্যে দু-এক জন রোমক বাদশার

উল্লেখ রয়েছে, এমন ভাবে রয়েছে যে প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়— তাহলে সে পুস্তকটি সিকন্দর বাদশার সময়ের নয় বলে প্রমাণ হল।

তৃতীয় উপায় ভাষা—সময়ে সময়ে সকল ভাষারই পরিবর্তন হচ্চে, আবার এক এক লেখকের এক একটা ঢঙ থাকে। যদি একটা পুস্তকে খামকা একটা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা লেখকের বিপরীত ঢঙে থাকে, তাহলেই সেটা প্রক্ষিপ্ত বলে সন্দেহ হবে। এই প্রকার নানা প্রকারে সন্দেহ, সংশয়, প্রমাণ প্রয়োগ করে গ্রন্থতত্ত্ব-নির্ণয়ের এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়ল।

চতুর্থ উপায়—তার উপর আধুনিক বিজ্ঞান দ্রুতপদসঞ্চারে নানা দিক হতে রশ্মি বিকিরণ করতে লাগলো; ফল—যে পুস্তকে কোন অলৌকিক ঘটনা লিখিত আছে, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য হয়ে পড়ল।

সকলের উপর—মহাতরঙ্গরূপ সংস্কৃত ভাষার ইওরোপে প্রবেশ এবং ভারতবর্ষে, ইউফ্রেটিস নদীতটে ও মিসরদেশে প্রাচীন শিলালেখের পুনঃ পঠন; আর বহুকাল ভূগর্ভে বা পর্বতপার্শ্বে লুক্কায়িত মন্দিরাদির আবিষ্ক্রিয়া ও তাহাদের যথার্থ ইতিহাসের জ্ঞান। পূর্বে বলেছি যে, এ নূতন গবেষণা-বিদ্যা 'বাইবেল' বা 'নিউ টেস্টামেন্ট' গ্রন্থগুলিকে আলাদা রেখেছিল। এখন মারধোর, জ্যান্ত পোড়ানো তো আর নেই, কেবল সমাজের ভয়, তা উপেক্ষা করে অনেকগুলি পণ্ডিত উক্ত পুস্তকগুলিকেও বেজায় বিশ্লেষ করেছেন। আশা করি, হিন্দু প্রভৃতির ধর্মপুস্তকে ওঁরা যেমন বেপরোয়া হয়ে টুকরো টুকরো করেন, কালে সেই প্রকার সৎসাহসের সহিত ইহুদী ও ক্রিশ্চান পুস্তকাদিকেও করবেন। একথা বলি কেন, তার একটা উদাহরণ দিই—মাসপরো (Maspero) বলে এক মহাপণ্ডিত, মিসর প্রত্নতত্ত্বের অতিপ্রতিষ্ঠ লেখক, 'ইস্তোয়ার আঁসিএন ওরিআঁতাল'[১] বলে মিসর ও বাবিলদিগের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থের এক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদের ইংরেজীতে তর্জমা পড়ি। এবার ব্রিটিশ মিউজিয়মের (British Museum) এক অধ্যক্ষকে কয়েকখানি মিসর ও বাবিল-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মাসপেরোর গ্রন্থের কথা উল্লেখ হয়। তাতে আমার কাছে উক্ত গ্রন্থের তর্জমা আছে শুনে তিনি বললেন যে

১ Histoire Anciene Oriental

ওতে হবে না, অনুবাদক কিছু গোঁড়া ক্রিশ্চান; এজন্য যেখানে যেখানে মাসপেরোর অনুসন্ধান খ্রীষ্টধর্মকে আঘাত করে, সে সব গোলমাল করে দেওয়া আছে! মূল ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ পড়তে বললেন। পড়ে দেখি তাইতো—এ যে বিষম সমস্যা। ধর্মগোঁড়ামিটুকু কেমন জিনিস জান তো?—সত্যাসত্য সব তাল পাকিয়ে যায়। সেই অবধি ও-সব গবেষণা-গ্রন্থের তর্জমার ওপর অনেকটা শ্রদ্ধা কমে গেছে।

আর এক নূতন বিদ্যা জন্মেছে, যার নাম জাতিবিদ্যা (ethnology), অর্থাৎ মানুষের রঙ, চুল, চেহারা, মাথার গঠন, ভাষা প্রভৃতি দেখে শ্রেণীবদ্ধ করা।

জার্মানরা সর্ববিদ্যায় বিশারদ হলেও সংস্কৃত আর প্রাচীন আসিরীয় বিদ্যায় বিশেষ পটু; বর্নফ (Burnouf) প্রভৃতি জার্মান পণ্ডিত ইহার নিদর্শন। ফরাসীরা প্রাচীন মিসরের তত্ত্ব উদ্ধারে বিশেষ সফল—মাসপেরো প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী ফরাসী। ওলন্দাজেরা ইহুদী ও প্রাচীন খ্রীষ্টধর্মের বিশ্লেষণে বিশেষ প্রতিষ্ঠ—কুনা (Kuenen) প্রভৃতি লেখক জগৎপ্রসিদ্ধ। ইংরেজরা অনেক বিদ্যার আরম্ভ করে দিয়ে তারপর সরে পড়ে।

এই সকল পণ্ডিতদের মত কিছু বলি। যদি ভাল না লাগে তাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি কর, আমায় দোষ দিও না।

হিঁদু, ইহুদী, প্রাচীন বাবিলি, মিসরি প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের মতে, সমস্ত মানুষ এক আদিম পিতামাতা হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ-কথা এখন লোকে বড় মানতে চায় না।

কালো কুচকুচে, নাকহীন, ঠোঁটপুরু, গড়ানে কপাল, আর কোঁকড়া-চুল কাফ্রি দেখেছ? প্রায় ঐ ঢঙের গড়ন, তবে আকারে ছোট, চুল অত কোঁকড়া নয়, সাঁওতালি আণ্ডামানি ভিল দেখেছ? প্রথম শ্রেণীর নাম নিগ্রো (Negro)। এদের বাসভূমি আফ্রিকা। দ্বিতীয় জাতির নাম নেগ্রিটো (Negrito)—ছোট নিগ্রো; এরা প্রাচীন কালে আরবের কতক অংশে, ইউফ্রেটিস্ তটের অংশে, পারস্যের দক্ষিণভাগে, ভারতবর্ষময় আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে, মায় অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বাস করত। আধুনিক সময়ে ভারতের কোন কোন ঝোড়-জঙ্গলে, আণ্ডামানে এবং অস্ট্রেলিয়ায় এরা বর্তমান।

লেপচা, ভুটিয়া, চীনি প্রভৃতি দেখেছ?—সাদা রঙ বা হলদে, সোজা

কালো চুল? কালো চোখ, কিন্তু চোখ কোনাকুনি বসান, দাড়ি গোঁফ অল্প, চেপটা মুখ, চোখের নিচের হাড় দুটো ভারি উঁচু।

নেপালি, বর্মি, সায়ামি, মালাই, জাপানি দেখেছ? এরা ঐ গড়ন, তবে আকারে ছোট।

এ শ্রেণীর দুই জাতির নাম মোগল (Mongols) আর মোগলইড্ (ছোট মোগল)। 'মোগল' জাতি এক্ষণে অধিকাংশ আশিয়াখণ্ড দখল করে বসেছে। এরাই মোগল, কাল্‌মুখ (Kalmucks) হুন, চীন, তাতার, তুর্গ, মানচু, কিরগিজ প্রভৃতি বিবিধ শাখায় বিভক্ত হয়ে এক চীন ও তিব্বতি সওয়ায়[১] তাঁবু নিয়ে আজ এদেশ, কাল ওদেশ করে ভেড়া ছাগল গরু ঘোড়া চরিয়ে বেড়ায়, আর বাগে পেলেই পঙ্গপালের মতো এসে দুনিয়া ওলট-পালট করে দেয়। এদের আর একটি নাম তুরানি। ইরান তুরান—সেই তুরান।

রঙ কালো, কিন্তু সোজা চুল, সোজা নাক, সোজা কালো চোখ—প্রাচীন মিসর, প্রাচীন বাবিলোনিয়ায় বাস করত এবং অধুনা ভারতময়—বিশেষ দক্ষিণদেশে বাস করে; ইওরোপেও এক-আধ জায়গায় চিহ্ন পাওয়া যায়—এ এক জাতি। এদের পারিভাষিক নাম দ্রাবিড়ি।

সাদা রঙ, সোজা চোখ, কিন্তু কান নাক—রামছাগলের মুখের মতো বাঁকা আর ডগা মোটা, কপাল গড়ানে, ঠোঁট পুরু—যেমন উত্তর আরবের লোক, বর্তমান ইহুদী, প্রাচীন বাবিলি, আসিরি, ফিনিক প্রভৃতি। এদের ভাষাও এক প্রকারের; এদের নাম সেমিটিক। আর যারা সংস্কৃতের সদৃশ ভাষা কয়, সোজা নাক মুখ চোখ, রঙ সাদা, চুল কালো বা কটা, চোখ কালো বা নীল, এদের নাম আরিয়ান।

বর্তমান সমস্ত জাতিই এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ওদের মধ্যে যে জাতির ভাগ অধিক যে দেশে, সে দেশের ভাষা ও আকৃতি সেই জাতির ন্যায়।

উষ্ণদেশ হলেই যে রঙ কালো হয় এবং শীতল দেশ হলেই যে বর্ণ সাদা হয়, এ-কথা এখনকার অনেকেই মানেন না। কালো এবং সাদার মধ্যে যে বর্ণগুলি, সেগুলি অনেকের মতে, জাতি-মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে।

১ সওয়ায়—(আরবী শব্দ) ব্যতীত, ছাড়া।

মিসর ও প্রাচীন বাবিলের সভ্যতা পণ্ডিতদের মতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ সকল দেশে খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর বা ততোধিক সময়ের বাড়ি-ঘর-দোর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে জোর চন্দ্রগুপ্তের সময়ের যদি কিছু পাওয়া গিয়ে থাকে—খ্রীঃ পূঃ ৩০০ বৎসর মাত্র। তার পূর্বের বাড়ি-ঘর এখনও পাওয়া যায় নাই।[১] তবে তার বহু পূর্বের পুস্তকাদি আছে, যা অন্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেছেন যে, হিন্দুদের 'বেদ' অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ পাঁচ হাজার বৎসর আগে বর্তমান আকারে ছিল।

১ হরপ্পা এবং মহেঞ্জোডারো গ্রামে ভূগর্ভে খ্রীঃ পূঃ ৩৩০০ বৎসর পূর্বেকার সভ্যতা নিদর্শনসকল পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইহাকে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা বলিয়াছেন।

ইওরোপী সভ্যতা

এই ভূমধ্যসাগর-প্রান্ত—যে ইওরোপী সভ্যতা এখন বিশ্বজয়ী, তার জন্মভূমি। এই তটভূমিতে মিসরি, বাবিলি, ফিনিক, ইহুদী প্রভৃতি সেমিটিক জাতিবর্গ ও ইরানী, যবন, রোমক প্রভৃতি আর্যজাতির সংমিশ্রণে বর্তমান ইওরোপী সভ্যতা।

'রোজেট্টা স্টোন'[১] নামক একখণ্ড বৃহৎ শিলালেখ মিসরে পাওয়া যায়। তার উপর জীবজন্তুর লাঙ্গুল ইত্যাদি রূপ চিত্রলিপিতে[২] লিখিত এক লেখ আছে, তার নিচে আর এক প্রকার লেখ, সকলের নিম্নে গ্রীক ভাষার অনুযায়ী লেখ। একজন পণ্ডিত ঐ তিন লেখকে এক অনুমান করেন। কপ্ত (Copts) নামক যে ক্রিশ্চান জাতি এখনও মিসরে বর্তমান এবং যারা প্রাচীন মিসবিদেব বংশধর বলে বিদিত, তাদের লেখের সাহায্যে তিনি এই প্রাচীন মিসরি লিপির উদ্ধার করেন। ঐরূপ বাবিলদের ইট এবং টালিতে খোদিত ভল্লাগ্রের ন্যায় লিপিও ক্রমে উদ্ধার হয়। এদিকে ভারতবর্ষের লাঙ্গলাকৃতি কতকগুলি লেখ মহারাজ অশোকের সমসাময়িক লিপি বলে আবিষ্কৃত হয়। এতদপেক্ষা প্রাচীন লিপি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। মিসরময় নানাপ্রকার মন্দির, স্তম্ভ, শবাধার ইত্যাদিতে যে সকল চিত্রলিপি লিখিত ছিল, ক্রমে সেগুলি পঠিত হয়ে প্রাচীন মিসরতত্ত্ব বিশদ করে ফেলেছে।

মিসরিরা সমুদ্রপার 'পুন্ট্' (Punt) নামক দক্ষিণ দেশ হতে মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ 'পুন্ট্'-ই বর্তমান মালাবার, এবং মিসরিরা ও দ্রাবিড়িরা এক জাতি। এদের প্রথম রাজার নাম 'মেনুস' (Menes)। এদের প্রাচীন ধর্মও কোন কোন অংশে আমাদের পৌরাণিক কথার ন্যায়। 'শিবু' (Shibu) দেবতা 'নুই' (Nui) দেবীর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিলেন, পরে আর এক দেবতা 'শু' (Shu) এসে বলপূর্বক 'নুই'-কে তুলে ফেললেন। 'নুই'র শরীর আকাশ হল, দু হাত আর দু পা হল সেই আকাশের

১ Rosetta Stone

২ Hieroglyphics

চার স্তম্ভ। আর 'শিবু' হলেন পৃথিবী। 'নুই'র পুত্র-কন্যা 'অসিরিস' আর 'ইসিস'—মিসরের প্রধান দেব-দেবী এবং তাঁদের পুত্র 'হোরস্' সর্বোপাস্য। এই তিনজন একসঙ্গে উপাসিত হতেন। 'ইসিস' আবার গো-মাতা রূপে পূজিত।

পৃথিবীতে 'নীল' নদের ন্যায়, আকাশ ঐ প্রকার নীল নদ আছেন—পৃথিবীর নীল নদ তাঁহার অংশ মাত্র। সূর্যদেব এদের মতে নৌকায় করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন; মধ্যে মধ্যে 'অহি' নামক সর্প তাঁকে গ্রাস করে, তখন গ্রহণ হয়।

চন্দ্রদেবকে এক শূকর মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করে এবং খণ্ড খণ্ড করে ফেলে, পরে পনের দিন তাঁর সারতে লাগে। মিসরের দেবতাসকল কেউ শৃগালমুখ, কেউ বাজের মুখযুক্ত, কেউ গোমুখ ইত্যাদি!

সঙ্গে সঙ্গেই ইউফ্রেটিস-তীরে আর এক সভ্যতার উত্থান হয়েছিল, তাদের মধ্যে 'বাল', 'মোলখ', 'ইস্তারত' ও 'দমুজি'[১] প্রধান। ইস্তারত দমুজিনামক মেষপালকের প্রণয়ে আবদ্ধ হলেন। এক বরাহ দমুজিকে মেরে ফেললে। পৃথিবীর নিচে পরলোকে ইস্তারত দমুজির অন্বেষণে গেলেন। সেথায় 'আলাৎ' নামক ভয়ঙ্করী দেবী তাঁকে বহু যন্ত্রণা দিলে। শেষে ইস্তারত বললেন যে, আমি দমুজিকে না পেলে মর্ত্যলোকে আর যাব না। মহা মুশকিল; উনি হলেন কামদেবী, উনি না এলে মানুষ, জন্তু, গাছপালা আর কিছুই জন্মাবে না। তখন দেবতারা সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রতি বৎসর দমুজি চার মাস থাকবেন পরলোকে—পাতালে, আর আট মাস থাকবেন মর্ত্যলোকে। তখন ইস্তারত ফিরে এলেন—বসন্তের আগমন হল, শস্যাদি জন্মাল।

এই 'দমুজি' আবার 'আদুনোই' বা 'আদুনিস'[২] নামে বিখ্যাত। সমস্ত সেমিটিক জাতিদের ধর্ম কিঞ্চিৎ অবান্তরভেদে প্রায় এক রকমই ছিল। বাবিলি, ইহুদি, ফিনিক ও পরবর্তী আরবদের একই প্রকার উপাসনা ছিল। প্রায় সকল দেবতারই নাম 'মোলখ' (যে শব্দটি বাঙলা ভাষাতে মালিক মুল্লুক ইত্যাদি রূপে এখনও রয়েছে) অথবা 'বাল', তবে অবান্তরভেদ ছিল। কারু কারু মত—এ 'আলাৎ' দেবতা পরে আরবদিগের আল্লা হলেন। এই

---

১ Baal., Moloch, Istárte, Damuzi

২ Adunoı or Adonis

সকল দেবতার পূজার মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক ও জঘন্য ব্যাপারও ছিল। মোলখ বা বালের নিকট পুত্র-কন্যাকে জীবন্ত পোড়ানো হত। ইস্তারতের মন্দির স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কামসেবা প্রধান অঙ্গ ছিল।

ইহুদী জাতির ইতিহাস বাবিল অপেক্ষা অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদের মতে 'বাইবেল' নামক ধর্মগ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ হতে আরম্ভ হয়ে খ্রীঃ পর পর্যন্ত লিখিত হয়। বাইবেলের অনেক অংশ যা পূর্বের বলে প্রথিত, তা অনেক পরের। এই বাইবেলের মধ্যে স্থূল কথাগুলি 'বাবিল' জাতির। বাবিলদের সৃষ্টিবর্ণনা, জলপ্লাবনবর্ণনা অনেক স্থলে বাইবেল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার উপর পারসী বাদশারা যখন আসিয়া মাইনরের উপর রাজত্ব করতেন, সেই সময় অনেক 'পারসী' মত ইহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবেলেব প্রাচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব—আত্মা বা পরলোক নাই। নবীন ভাগে পারসীদের পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান ইত্যাদি দৃষ্ট হয়; এবং শয়তানবাদটি একেবারে পারসীদের।

ইহুদীদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ 'য়াভে' নামক 'মোলখের'[১] পূজা। এই নামটি কিন্তু ইহুদী ভাষার নয়, কারু কারু মতে ঐটি মিসরি শব্দ। কিন্তু কোথা থেকে এল, কেউ জানে না। বাইবেলে বর্ণনা আছে যে, ইহুদীরা মিসরে আবদ্ধ হয়ে অনেকদিন ছিল—সে-সব এখন কেউ বড় মানে না এবং 'ইব্রাহিম', 'ইসহাক', 'ইয়ুসুফ' প্রভৃতি গোত্রপিতাদের রূপক বলে প্রমাণ করে।

ইহুদীরা 'য়াভে' এ নাম উচ্চারণ করত না, তার স্থানে 'আদুনোই' বলত। যখন ইহুদীরা ইস্রেল আর ইফ্রেম[২] দুই শাখায় বিভক্ত হল, তখন দুই দেশে দুটি প্রধান মন্দির নির্মিত হল। জেরুসালেমে ইস্রেলদেব যে মন্দির নির্মিত হল, তাতে 'য়াভে' দেবতার একটি নরনারী সংযোগমূর্তি এক সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত হত। দ্বারদেশে একটি বৃহৎ পুংচিহ্ন স্তম্ভ ছিল। ইফ্রেমে 'য়াভে' দেবতা—সোনামোড়া বৃষের মূর্তিতে পূজিত হতেন।

উভয় স্থানেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেবতার নিকট জীবন্ত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত এবং একদল স্ত্রীলোক ঐ দুই মন্দিরে বাস করত; তারা মন্দিরের মধ্যেই বেশ্যাবৃত্তি করে যা উপার্জন করত, তা মন্দিরের ব্যয়ে লাগত।

---

১ Yave-Moloch

২ Israel, Ephraim

ক্রমে ইহুদীদের মধ্যে একদল লোকের প্রাদুর্ভাব হল; তাঁরা গীত বা নৃত্যের দ্বারা আপনাদের মধ্যে দেবতার আবেশ করতেন। এদের নাম নবী বা Prophet (ভাববাদী)। এদের মধ্যে অনেক ইরানীদের সংসর্গে মূর্তিপূজা, পুত্রবলি, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির বিপক্ষ হয়ে পড়ল। ক্রমে বলির জায়গায় হল 'সুন্নত'; বেশ্যাবৃত্তি, মূর্তি আদি ক্রমে উঠে গেল; ক্রমে ঐ নবী-সম্প্রদায়ের মধ্য হতে ক্রিশ্চান ধর্মের সৃষ্টি হল।

'ঈশা' নামক কোন পুরুষ কখনও জন্মেছিলেন কি না, এ নিয়ে বিষম বিতণ্ডা। 'নিউ টেস্টামেন্টের' যে চার পুস্তক, তার মধ্যে 'সেন্ট-জন' নামক পুস্তক তো একেবারে অগ্রাহ্য হয়েছে। বাকি তিনখানি—কোন এক প্রাচীন পুস্তক দেখে লেখা, এই সিদ্ধান্ত: তাও 'ঈশা'-হজরতের যে সময় নির্দিষ্ট আছে, তার অনেক পরে।

তার উপর যে সময় ঈশা জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি, সে সময় ঐ ইহুদীদের মধ্যে দুইজন ঐতিহাসিক জন্মেছিলেন—'জোসিফুস্' আর 'ফিলো'[১]। এঁরা ইহুদীদের মধ্যে ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঈশা বা ক্রিশ্চানদের নামও নাই; অথবা রোমান জজ তাঁকে ক্রুশে মারতে হুকুম দিয়েছিল, এর কোন কথাই নাই। জোসিফুসের পুস্তকে এক ছত্র ছিল, তা এখন প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণ হয়েছে।

রোমকরা ঐ সময় ইহুদীদের উপর রাজত্ব করত, গ্রীকরা সকল বিদ্যা শেখাত। এঁরা সকলেই ইহুদীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন, কিন্তু ঈশা বা ক্রিশ্চানদের কোন কথাই নাই।

আবার মুশকিল যে, যে সকল কথা, উপদেশ বা মত নিউ টেস্টামেন্ট গ্রন্থে প্রচার আছে, ও-সমস্তই নানা দিগ্‌দেশ হতে এসে খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ইহুদীদের মধ্যে বর্তমান ছিল এবং 'হিলেল্'[২] প্রভৃতি রাব্বিগণ (উপদেশক) প্রচার করেছিলেন। পণ্ডিতরা তো এই সব বলছেন, তবে অন্যের ধর্ম সম্বন্ধে—যেমন সাঁ করে এক কথা বলে ফেলেন, নিজেদের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে তা বললে কি আর জাঁক থাকে? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছেন। এর নাম 'হায়ার ক্রিটিসিজম্' (Higher Criticism)।

১ Josephus, Philo

২ Hillel

পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী এই প্রকার দেশ-দেশান্তরের ধর্ম, নীতি, জাতি ইত্যাদির আলোচনা করছেন। আমাদের বাঙলা ভাষায় কিছুই নাই। হবে কি করে? —এক বেচারা ১০ বৎসর হাড়গোড়ভাঙা পরিশ্রম করে যদি এইরকম একখানা বই তর্জমা করে তো সে নিজেই বা খায় কি, আর বই বা ছাপায় কি দিয়ে?

একে দেশ অতি দরিদ্র, তাতে বিদ্যা একেবারে নেই বললেই হয়। এমন দিন কি হবে যে, আমরা নানাপ্রকার বিদ্যার চর্চা করব? 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্, যৎ কৃপা...'!—মা জগদম্বাই জানেন।

জাহাজ নেপল্‌সে লাগল—আমরা ইতালীতে পৌঁছুলাম। এই ইতালীর রাজধানী রোম। এই রোম, সেই প্রাচীন মহাবীর্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী —যার রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, উপনিবেশ-সংস্থাপন, পরদেশ-বিজয় এখনও সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ!

নেপল্‌স ত্যাগ করে জাহাজ মার্সাইতে লেগেছিল, তারপর একেবারে লণ্ডন।

ইওরোপ সম্বন্ধে তোমাদের তো নানা কথা শোনা আছে—তারা কি খায়, কি পরে, কি রীতিনীতি আচার ইত্যাদি—তা আর আমি কি বলবো! তবে ইওরোপী সভ্যতা কি, এর উৎপত্তি কোথায়, আমাদের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ, এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত—এ সব সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার রইল। শরীর কাউকে ছাড়ে না ভায়া, অতএব বারান্তরে সে-সব কথা বলতে চেষ্টা করবো। অথবা বলে কি হবে? বকাবকি বলা-কওয়াতে আমাদের (বিশেষ বাঙালীর) মতো কে বা মজবুত? যদি পার তো করে দেখাও। কাজ কথা কউক, মুখকে বিরাম দাও। তবে একটা কথা বলে রাখি, গরিব নিম্ন-জাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইওরোপ উঠতে লাগলো। রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরিব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড! বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী—এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে

যায় না; এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরিব নীচ যারা, তারাই হচ্চে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না; কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে—এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিস যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিস প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই তো সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ। বাধাও নাই, সিদ্ধিও নাই। অলমিতি।

ইওরোপে

আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চক্কর। বোধ হয় বলি কেন?—পা নিরীক্ষণ করে, চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে বিফল; সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি চৌ-চাকলা, তায় চক্কর ফক্কর বড় দেখা গেল না। যা হোক—যখন কিংবদন্তী রয়েছে তখন মেনে নিলুম যে, আমার পা চক্করময়। ফল কিন্তু সাক্ষাৎ—এত মনে করলুম যে, পারিতে বসে কিছুদিন ফরাসী ভাষা ও সভ্যতা আলোচনা করা যাবে; পুরানো বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে, এক গরিব ফরাসী নবীন বন্ধুর বাসায় গিয়ে বাস করলুম—(তিনি জানেন না ইংরেজী, আমার ফরাসী—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!) বাসনা যে, বোবা হয়ে বসে থাকার না-পারকতায়—(কাজে কাজেই) ফরাসী বলবার উদ্যোগ হবে, আর গড়গড়িয়ে ফরাসী ভাষা এসে পড়বে। [তা নয়] কোথায় চললুম ভিয়েনা, তুরকি, গ্রীস, ইজিপ্ত, জেরুসালেম পর্যটন করতে। ভবিতব্য কে ঘোচায় বলো। তোমায় পত্র লিখছি মুসলমান প্রভুত্বের অবশিষ্ট রাজধানী কনস্টান্টিনোপল হতে।

সঙ্গের সঙ্গী তিন জন—দুজন ফরাসী, একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস ম্যাক্লাউড, ফরাসী পুরুষ বন্ধু মস্যিয় জুল বোওয়া—[১] ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্যলেখক; আর ফরাসিনী বন্ধু জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল কালভে[২]। ফরাসী ভাষায় 'মিস্টর' হচ্চেন 'মস্যিয়', আর 'মিস' হচ্চেন 'মাদ্‌মোয়াজেল'—'জ'টা পূর্ব-বাঙলার 'জ'। মাদ্‌মোয়াজেল কালভে আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা—অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব হতে।

পাশ্চাত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্ণহার্ড,[৩] আর সর্বশ্রেষ্ঠা

---

১ Monsiour Jules Bois

২ Mademoiselle Calve

৩ Sarah Bernhardt

গায়িকা কালভে—দুজনেই ফরাসী, দুজনেই ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে যান ও অভিনয় [করে] আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেন। ফরাসী ভাষা সভ্যতার ভাষা—পাশ্চাত্য জগতের ভদ্রলোকের চিহ্ন—সকলেই জানে; কাজেই এদের ইংরেজী শেখবার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি নাই।

মাদাম বার্নহার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন, তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ [স্ত্রী বা পুরুষ চরিত্র] অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল! বালিকা বালক, যা বল তাই—হুবহু, আর সে আশ্চর্য আওয়াজ! এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে! বার্নহার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ 'ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে' (trés ancien trés civilisé)—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা—বিলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোশাক, রাস্তা, ঘাট পরিচয় করেছি'। বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—'সে মঁ র‍্যাভ (C'est mon rave) সে মঁ র‍্যাভ'—সে আমার জীবনস্বপ্ন। আবার প্রিন্স অব ওয়েল্স[১] তাঁকে বাঘ হাতি শিকার করাবেন প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্নহার্ড বললেন—সে দেশে যেতে গেলে, দেড় লাখ দু-লাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই—'লা দিভিন সারা!!' (La divine Sarah)—দৈবী সারা—তাঁর আবার টাকার অভাব কি?—যাঁর স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন গতায়াত নেই!—সে ধুম বিলাস, ইওরোপের অনেক রাজা-রাজড়া পারে না; যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নেই, তবে সারা বার্নহার্ড বেজায় খরচে। তাঁর ভারতভ্রমণ কাজেই এখন রইল।

মাদমোয়াজেল কালভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন—ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি—এঁর অতিথি হয়ে। কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন, তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের

১ পরে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড

বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়; ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন!—রাজা -বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম মেলবা, মাদাম এমা এমস্ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকাসকল আছেন, জাঁ দ্য রেজকি, প্লাঁসঁ[১] প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়কসকল আছেন; এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগাব করেন! কিন্তু কালভের বিদ্যাব সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা! অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা আর দৈবী কণ্ঠ— এ-সব একত্র সংযোগে কালভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই! সে শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র্য দুঃখ কষ্ট—যার সঙ্গে দিনবাত যুদ্ধ করে কালভের এই বিজয়লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে। আবার এ দেশে উদ্যোগ যেমন, উপায়ও তেমন। আমাদের দেশে উদ্যোগ থাকলেও উপায়ের একান্ত অভাব। বাঙালীর মেয়ের বিদ্যা শেখবার সমধিক ইচ্ছা থাকলেও উপায়াভাবে বিফল; বাঙলা ভাষায় আছে কি শেখবার? বড় জোর পচা নভেল-নাটক!! আবার বিদেশী ভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বিদ্যা, দু-চার জনের জন্য মাত্র। এ-সব দেশে নিজের ভাষায় অসংখ্য পুস্তক; তার উপর যখন যে ভাষায় একটা নূতন কিছু বেরুচ্চে, তৎক্ষণাৎ তার অনুবাদ করে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করছে।

মস্যিয় জুল বোওয়া প্রসিদ্ধ লেখক; ধর্মসকলের, কুসংস্কাবসকলের ঐতিহাসিক তত্ত্ব-আবিষ্কারে বিশেষ নিপুণ। মধ্যযুগে ইওরোপে যে-সকল শয়তান-পূজা, জাদু, মারণ, উচাটন, ছিটেফোঁটা মন্ত্রতন্ত্র ছিল এবং এখনও যা কিছু আছে, সে-সকল ইতিহাসবদ্ধ করে এঁর এক প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইনি সুকবি এবং ভিক্তর হ্যুগো, লা মার্টিন প্রভৃতি ফরাসী মহাকবি এবং গ্যেটে, শিলার প্রভৃতি জার্মান মহাকবিদের ভেতর যে ভারতের বেদান্তভাব প্রবেশ করেছে, সেই ভাবের পোষক। বেদান্তের প্রভাব ইওরোপে—কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমধিক। ভাল কবি মাত্রই দেখছি বেদান্তী; দার্শনিক তত্ত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেদান্ত। তবে কেউ কেউ স্বীকার করতে চায় না, নিজের সম্পূর্ণ নূতনত্ব বাহাল রাখতে চায়—যেমন হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি; কিন্তু

১ **Jean de Reszke, Plancon**

অধিকাংশরাই স্পষ্ট স্বীকার করে। এবং না করে যায় কোথা —এ তার, রেলওয়ে, খবরকাগজের দিনে? ইনি অতি নিরভিমান, শান্তপ্রকৃতি, এবং সাধারণ অবস্থার লোক হলেও অতি যত্ন করে আমায় নিজের বাসায় প্যারিসে রেখেছিলেন। এখন একসঙ্গে ভ্রমণে চলেছেন।

কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পথের সঙ্গী আর এক দম্পতি—পেয়র হিয়াসান্থ[১] এবং তাঁর সহধর্মিণী। পেয়র (অর্থাৎ পিতা) হিয়াসান্থ ছিলেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এক কঠোর তপস্বি-শাখাভুক্ত সন্ন্যাসী। পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতাগুণে এবং তপস্যার প্রভাবে ফরাসী দেশে এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে এঁর অতিশয় প্রতিষ্ঠা ছিল। মহাকবি ভিক্তর হ্যুগো দুজন লোকের ফরাসী ভাষার প্রশংসা করতেন—তার মধ্যে পেয়র হিয়াসান্থ একজন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পেয়র হিয়াসান্থ এক আমেরিক নারীর প্রণয়াবদ্ধ হয়ে তাকে করে ফেললেন বে—মহা হুলস্থূল পড়ে গেল; অবশ্য ক্যাথলিক সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ করলে। শুধু পা, আলখাল্লা-পরা তপস্বি-বেশ ফেলে পেয়র হিয়াসান্থ গৃহস্থের হ্যাট কোট বুট পরে হলেন—মস্যিয় লয়জন্।[২] আমি কিন্তু তাঁকে তাঁর পূর্বের নামেই ডাকি। সে অনেক দিনের কথা, ইওরোপ-প্রসিদ্ধ হাঙ্গাম! প্রটেস্টান্টরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলে, ক্যাথলিকরা ঘৃণা করতে লাগলো। পোপ লোকটার গুণাতিশয্যে তাঁকে ত্যাগ করতে না চেয়ে বললেন, 'তুমি গ্রীক ক্যাথলিক পাদ্রী হয়ে থাকো (সে শাখায় পাদ্রী একবার মাত্র বে করতে পায়, কিন্তু বড় পদ পায় না), কিন্তু রোমান চার্চ ত্যাগ করো না।' কিন্তু লয়জন্-গেহিনী তাঁকে টেনে হিঁচড়ে পোপের ঘর থেকে বার করলে। ক্রমে পুত্র পৌত্র হল; এখন অতি স্থবির লয়জন্ জেরুসালেমে চলেছেন—ক্রিশ্চান আর মুসলমানের মধ্যে যাতে সদ্ভাব হয়, সেই চেষ্টায়। তাঁর গেহিনী বোধ হয় অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, লয়জন্ বা দ্বিতীয় মার্টিন্ লুথার হয়, পোপের সিংহাসন উল্টে বা ফেলে দেয়—ভূমধ্যসাগরে। সে সব তো কিছুই হল না; হল— ফরাসীরা বলে, 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ'। কিন্তু মাদাম লয়জনের—সে নানা দিবাস্বপ্ন চলেছে!!

১ Pere Hyacinthe

২ Monsieur Loyson

বৃদ্ধ লয়জন্ অতি মিষ্টভাষী, নম্র, ভক্ত প্রকৃতির লোক। আমার সঙ্গে দেখা হলেই কত কথা—নানা ধর্মের, নানা মতের। তবে ভক্ত মানুষ—অদ্বৈতবাদে একটু ভয় খাওয়া আছে। গিন্নির ভাবটা বোধ হয় আমার উপর কিছু বিরূপ। বৃদ্ধের সঙ্গে যখন আমার ত্যাগ বৈরাগ্য সন্ন্যাসের চর্চা হয়, স্থবিরের প্রাণে—সে চিরদিনের ভাব জেগে ওঠে, আর গিন্নির বোধহয় গা কস্ কস্ করে। তার উপর মেয়ে-মদ্দ সমস্ত ফরাসীরা যত দোষ গিন্নির উপর ফেলে; বলে, 'ও মাগী আমাদের এক মহাতপস্বী সাধুকে নষ্ট করে দিয়েছে'!! গিন্নির কিছু বিপদ বইকি—আবার বাস হচ্ছে প্যারিসে, ক্যাথলিকের দেশে। বে-করা পাদ্রীকে ওরা দেখলে ঘৃণা করে, মাগ-ছেলে নিয়ে ধর্মপ্রচার এ ক্যাথলিক আদতে সহ্য করবে না। গিন্নির আবার একটু ঝাঁজ আছে কিনা। একবার গিন্নি এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন, 'তুমি বিবাহ না করে অমুকের সঙ্গে বাস করছ, তুমি বড় খারাপ'। সে অভিনেত্রী ঝট্ জবাব দিলে, 'আমি তোমাব চেযে লক্ষ গুণে ভালো। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করি, আইন-মত বে না হয় নাই করেছি; আর তুমি মহাপাপী—এতবড় একটা সাধুর ধর্ম নষ্ট করলে!! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠছিল, তা না হয় সাধুর সেবা- দাসী হযে থাকতে; তাকে বে করে—গৃহস্থ করে তাকে উৎসন্ন কেন দিলে?' 'পচাকুমড়ো শরীরের' কথা শুনে যে দেশে হাসতুম, তার আর এক দিক দিয়ে মানে হয়—দেখছ?

যাক, আমি সমস্ত শুনি, চুপ করে থাকি। মোদ্দা—বৃদ্ধ পেয়র হিয়াসান্থ বড়ই প্রেমিক আর শান্ত; সে খুশি আছে তার মাগ-ছেলে নিয়ে; দেশ শুদ্ধ লোকের তাতে কি? তবে গিন্নিটি একটু শান্ত হলেই বোধ হয় সব মিটে যায়। তবে কি জান ভায়া, আমি দেখছি যে, পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে সব দেশেই বোঝবার ও বিচার করবার রাস্তা আলাদা। পুরুষ একদিক দিয়ে বুঝবে, মেয়ে-মানুষ আর একদিক দিয়ে বুঝবে; পুরুষের যুক্তি এক রকম, মেয়েমানুষের আর এক রকম। পুরুষে মেয়েকে মাফ করে, আর পুরুষের ঘাড়ে দোষ দেয়; মেয়েতে পুরুষকে মাফ করে, আর সব দোষ মেয়ের ঘাড়ে দেয়।

এদের সঙ্গে আমার বিশেষ লাভ এই যে, ঐ এক আমেরিক ছাড়া এরা

কেউ ইংরেজী জানে না; ইংরেজী ভাষায় কথা একদম বন্ধ,[১] কাজেই কোন রকম করে আমায় কইতে হচ্চে ফরাসী এবং শুনতে হচ্চে ফরাসী।

প্যারিস নগরী হতে বন্ধুবর ম্যাকসিম্ নানাস্থানে চিঠিপত্র যোগাড় করে দিয়েছেন, যাতে দেশগুলো যথাযথ রকমে দেখা হয়। ম্যাকসিম্—বিখ্যাত 'ম্যাকসিম্ গানে'র নির্মাতা; যে তোপে ক্রমাগত গোলা চলতে থাকে—আপনি ঠাসে, আপনি ছোঁড়ে—বিরাম নাই। ম্যাকসিম্ আদতে আমেরিকান; এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি—। ম্যাকসিম্ তোপের কথা বেশি কইলে বিরক্ত হয়, বলে, 'আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি—ঐ মানুষ-মারা কলটা ছাড়া?' ম্যাকসিম্ চীন-ভক্ত, ভারত-ভক্ত, ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বইপত্র পড়ে অনেকদিন হতে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ—বেজায় অনুরাগ। আর ম্যাকসিম্ সব রাজা-রাজড়াকে তোপ বেচে, সব দেশে জানাশুনা, কিন্তু তাঁর বিশেষ বন্ধু লি হুং চাঙ, বিশেষ শ্রদ্ধা চীনের উপর, ধর্মানুরাগ কুংফুছে মতে। চীনে নাম নিয়ে মধ্যে মধ্যে কাগজে ক্রিশ্চান পাদ্রীদের বিপক্ষে লেখা হয়—তারা চীনে কী করতে যায়, কেন বা যায়, ইত্যাদি; ম্যাকসিম্ পাদ্রীদের চীনে ধর্মপ্রচার আদতে সহ্য করতে পারে না! ম্যাকসিমের গিন্নিটিও ঠিক অনুরূপ—চীন-ভক্তি, ক্রিশ্চানি-ঘৃণা! ছেলেপুলে নেই, বুড়ো মানুষ—অগাধ ধন।

যাত্রার ঠিক হল—প্যারিস থেকে রেলযোগে ভিয়েনা, তাবপর কনস্টান্টিনোপল, তারপর জাহাজে এথেন্স, গ্রীস, তারপর ভূমধ্যসাগরপার ইজিপ্ত, তারপর আশিয়া মাইনর, জেরুসালেম ইত্যাদি। 'ওরি-আঁতাল এক্সপ্রেস ট্রেন' প্যারিস হতে স্তাম্বুল পর্যন্ত ছোটে প্রতিদিন। তায় আমেরিকার নকলে শোবার বসবার খাবার স্থান। ঠিক আমেরিকার গাড়ির মতো সুসম্পন্ন না হলেও কতক বটে। সে গাড়িতে চড়ে ২৪শে অক্টোবর প্যারিস ছাড়তে হচ্চে।

১ পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে একটি রীতি এই-একটি দলেব মধ্যে সকলেই যে ভাষা জানেন, একত্র অবস্থানকালে সেই ভাষায কথা না কওযা অসভ্যতার পবিচায়ক।

ফ্রান্স ও জার্মানি

আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা-প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি —এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধ-মণ্ডলী-মণ্ডিত মহা বাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু— ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁর সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!

আর মিঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদিব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী ও যশস্বিনী নর-নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন, তারও আজ শেষ। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ মিস্টর লেগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষি-মনঃসংঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত!—তারও শেষ।

সকল জিনিসেরই অন্ত আছে। আজ আর একবার পুঞ্জীকৃত-ভাবরূপ-স্থিরসৌদামিনী, এই অপূর্ব-ভূস্বর্গ-সমাবেশ প্যারিস-এগজিবিশন দেখে এলুম।

আজ দু-তিন দিন ধরে প্যারিসে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্চে। ফ্রান্সের প্রতি সদা সদয় সূর্যদেব আজ ক-দিন বিরূপ। নানাদিগ্‌দেশাগত শিল্প, শিল্পী, বিদ্যা ও বিদ্বানের পশ্চাতে গূঢ়ভাবে প্রবাহিত ইন্দ্রিয়বিলাসের স্রোত দেখে ঘৃণায় সূর্যের মুখ মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা কাষ্ঠ বস্ত্র ও নানারাগরঞ্জিত এ মায়া অমরাবতীর আশু বিনাশ ভেবে তিনি দুঃখে মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলেন।

আমরাও পালিয়ে বাঁচি—এগজিবিশন ভাঙা এক বৃহৎ ব্যাপার। এই ভূস্বর্গ, নন্দনোপম প্যারিসের রাস্তা এক হাঁটু কাদা চুন বালিতে পূর্ণ হবেন। দু-একটা প্রধান ছাড়া এগজিবিশনের সমস্ত বাড়িঘরদোরই, কাটকুটরো, ছেঁড়া ন্যাতা, আর চুনকামের খেলা বইত নয়—যেমন সমস্ত সংসার! তা যখন ভাঙতে থাকে সে চুনের গুঁড়ো উড়ে দম আটকে দেয়; ন্যাতাচোতায়, বালি প্রভৃতিতে পথ ঘাট কদর্য করে তোলে; তার উপর বৃষ্টি হলেই সে বিরাট কাণ্ড!

২৪ অক্টোবর সন্ধ্যার সময় ট্রেন প্যারিস্ ছাড়লো; অন্ধকার রাত্রি—দেখবার কিছুই নাই। আমি আর মস্যিয় বোওয়া এক কামরায়—শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করলুম। নিদ্রা হতে উঠে দেখি, আমরা ফরাসী সীমানা ছাড়িয়ে জার্মান সাম্রাজ্যে উপস্থিত। জার্মানি পূর্বে বিশেষ করে দেখা আছে; তবে ফ্রান্সের পর জার্মানি—বড়ই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। 'যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং'—এক দিকে ভুবনস্পর্শী ফ্রান্স, প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে আস্তে আস্তে খাক হয়ে যাচ্চে; আর এক দিকে কেন্দ্রীকৃত নূতন মহাবল জার্মানি মহাবেগে উদয়শিখরাভিমুখে চলেছে। কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস; আর এক দিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জার্মানির স্থূলহস্তাবলেপ। প্যারিসের পর পাশ্চাত্য জগতে আর নগরী নাই; সব সেই প্যারিসের নকল—অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্পসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য; জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ, স্থূল। ফরাসী বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জার্মানির রূপবিকাশ-চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের

মতো—কস্তুরীর মতো এক মুহূর্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মতো—পারার মতো ভারি, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। জার্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত অশ্রান্তভাবে ঠুকঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে; ফরাসীর নরম শরীর—মেয়েমানুষের মতো; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।

জার্মান ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ি অট্টালিকা বানাচ্ছেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্তি—অশ্বারোহী, রথী—সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন করছেন, কিন্তু জার্মানের দোতলা বাড়ি দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, এ বাড়ি কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতি-উটের 'তবেলা'? আর ফরাসীর পাঁচতলা হাতি-ঘোড়া রাখবার বাড়ি দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়িতে বুঝি পরীতে বাস করবে!

আমেরিকা জার্মান-প্রবাহে অনুপ্রাণিত, লক্ষ লক্ষ জার্মান প্রত্যেক শহরে। ভাষা ইংরেজী হলে কি হয়, আমেরিকা আস্তে আস্তে 'জার্মানিত'[১] হয়ে যাচ্চে। জার্মানির প্রবল বংশবিস্তার; জার্মান বড়ই কষ্টসহিষ্ণু। আজ জার্মানি ইওরোপেব আদেশ-দাতা, সকলের উপর! অন্যান্য জাতের অনেক আগে জার্মানি প্রত্যেক নরনারীকে রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়ে বিদ্যা শিখিয়েছে; আজ সে বৃক্ষের ফল ভোজন করছে। জার্মানির সৈন্য প্রতিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠ; জার্মানি প্রাণপণ করেছে যুদ্ধপোতেও সর্বশ্রেষ্ঠ হতে; জার্মানির পণ্যনির্মাণ ইংরেজকেও পরাভূত করেছে! ইংরেজের উপনিবেশেও জার্মান পণ্য, জার্মান মনুষ্য ধীরে ধীরে একাধিপত্য লাভ করছে; জার্মানির সম্রাটের আদেশে সর্বজাতি চীনক্ষেত্রে[২] অবনত মস্তকে জার্মান সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করছেন!

সারাদিন ট্রেন জার্মানির মধ্য দিয়ে চলল; বিকাল বেলা জার্মান আধিপত্যের প্রাচীন কেন্দ্র—এখন পররাজ্য—অস্ট্রিয়ার সীমানায় উপস্থিত। এ ইওরোপে বেড়াবার কতকগুলি জিনিসের উপর বেজায় শুল্ক; অথবা কোন কোন পণ্য সরকারের একচেটে, যেমন তামাক। আবার রুশ ও তুর্কীতে তোমার রাজার ছাড়পত্র না থাকলে একেবারে প্রবেশ নিষেধ; ছাড়পত্র অর্থাৎ পাসপোর্ট একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া, রুশ এবং তুর্কীতে, তোমার বইপত্র

১ Germanised

২ চীনের যুদ্ধক্ষেত্রে

কাগজ সব কেড়ে নেবে; তারপর তারা পড়ে শুনে যদি বোঝে যে তোমার কাছে তুর্কীর বা রুশের রাজত্বের বা ধর্মের বিপক্ষে কোনও বই-কাগজ নেই, তাহলে তা তখন ফিরিয়ে দেবে—নতুবা সে সব বইপত্র বাজেয়াপ্ত করে নেবে। অন্য অন্য দেশে এ পোড়া তামাকের হাঙ্গামা বড়ই হাঙ্গামা। সিন্দুক, প্যাঁটরা, গাঁটরি—সব খুলে দেখাতে হবে, তামাক প্রভৃতি আছে কিনা। আর কনস্টান্টিনোপল আসতে গেলে দুটো বড়— জার্মানি আর অষ্ট্রিয়া এবং অনেকগুলো ক্ষুদে দেশের মধ্য দিয়ে আসতে হয়; ক্ষুদেগুলো পূর্বে তুরস্কের পরগণা ছিল, এখন স্বাধীন ক্রিশ্চান রাজারা একত্র হয়ে মুসলমানের হাত থেকে যতগুলো পেরেছে, ক্রিশ্চানপূর্ণ পরগণা ছিনিয়ে নিয়েছে এ ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড় ডেওদের চেয়েও অনেক অধিক।

অষ্ট্রিয়া ও হুঙ্গারি

২৫ অক্টোবর সন্ধ্যার পর ট্রেন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে পৌঁছুল। অস্ট্রিয়া ও রুশিয়ার রাজবংশীয় নর-নারীকে আর্ক-ড্যুক ও আর্ক-ডচেস বলে। এ ট্রেনে দুজন আর্ক-ড্যুক ভিয়েনায় নাববেন; তাঁরা না নাবলে অন্যান্য যাত্রীর আর নাববার অধিকার নাই। আমরা অপেক্ষা করে রইলুম। নানাপ্রকার জরিবুটা-র উর্দি-পরা জনকতক সৈনিক পুরুষ এবং পর-লাগানো (feathered) টুপি মাথায় জন-কতক সৈন্য আর্ক-ড্যুকদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আর্ক-ড্যুকদ্বয় নেমে গেলেন। আমরাও বাঁচলুম—তাড়াতাড়ি নেমে সিন্দুকপত্র পাস করাবার উদ্যোগ করতে লাগলুম। যাত্রী অতি অল্প; সিন্দুক-পত্র দেখিয়ে ছাড় করাতে বড় দেরি লাগলো না। পূর্ব হতে এক হোটেল ঠিকানা করা ছিল; সে হোটেলের লোক গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমরাও যথাসময়ে হোটেলে উপস্থিত হলুম। সে রাত্রে আর দেখা শুনা কি হবে—পরদিন প্রাতঃকালে শহর দেখতে বেরুলুম।

সমস্ত হোটেলেই এবং ইওরোপের ইংলণ্ড ও জার্মানি ছাড়া প্রায় সকল দেশেই ফরাসী চাল। হিঁদুদের মতো দুবার খাওয়া। প্রাতঃকালে দুপ্রহরের মধ্যে; সায়ংকালে ৮টার মধ্যে। প্রত্যুষে অর্থাৎ ৮।৯টার সময় একটু কাফি পান করা। চায়ের চাল—ইংলণ্ড ও রুশিয়া ছাড়া অন্যত্র বড়ই কম। দিনের ভোজনের ফরাসী নাম 'দেজুনে'[১] অর্থাৎ উপবাসভঙ্গ, ইংরেজী 'ব্রেকফাস্ট'। সায়ংভোজনের নাম 'দিনে', ইং—'ডিনার'। চা-পানের ধুম রুশিয়াতে অত্যন্ত—বেজায় ঠাণ্ডা, আর চীন-সন্নিকট। চীনের চা খুব উত্তম চা—তার অধিকাংশ যায় রুশে। রুশের চা-পানও চীনের অনুরূপ, অর্থাৎ দুগ্ধ মেশানো নেই। দুধ মেশালে চা বা কাফি বিষের ন্যায় অপকারক। আসল চা-পায়ী জাতি চীনে, জাপানী, রুশ, মধ্য-আশিয়াবাসী বিনা দুগ্ধে চা পান করে; তদ্বৎ আবার তুর্ক প্রভৃতি আদিম কাফিপায়ীজাতি বিনা দুগ্ধে কাফি পান করে। তবে রুশিয়ায়

---

১ Dejeuner

তার মধ্যে একটু পাতিনেবু এবং এক ডেলা চিনি চায়ের মধ্যে ফেলে দেয়। গরিবেরা এক ডেলা চিনি মুখের মধ্যে রেখে তার উপর দিয়ে চা পান করে এবং এক জনের পান শেষ হলে আর এক জনকে সে চিনির ডেলাটা বার করে দেয়। সে ব্যক্তিও সে ডেলাটা মুখের মধ্যে রেখে পূর্ব্ববৎ চা পান করে।

ভিয়েনা শহর—প্যারিসের নকলে ছোট শহর। তবে অষ্ট্রিয়ানরা হচ্চে জাতিতে জার্মান। অস্ট্রিয়ার বাদশা এতকাল প্রায় সমস্ত জার্মানির বাদশা ছিলেন। বর্তমান সময়ে প্রুশরাজ ভিলহেলমের দূরদর্শিতায়, মন্ত্রিবর বিসমার্কের অপূর্ব বুদ্ধি-কৌশলে, আর সেনাপতি ফন মল্টকির যুদ্ধপ্রতিভায় প্রুশরাজ অস্ট্রিয়া ছাড়া সমস্ত জার্মানির একাধিপতি বাদশা। হতশ্রী হতবীর্য অস্ট্রিয়া কোনওমতে পূর্বকালের নাম-গৌরব রক্ষা করছেন। অস্ট্রিয় রাজবংশ —হ্যাপসবর্গ বংশ, ইওরোপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অভিজাত রাজবংশ। যে জার্মান রাজন্যকুল ইওরোপের প্রায় সর্বদেশেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, যে জার্মানির ছোট ছোট করদ রাজা ইংলণ্ড ও রুশিয়াতেও মহাবল সাম্রাজ্যশীর্ষে সিংহাসন স্থাপন করেছে, সেই জার্মানির বাদশা এত কাল ছিল এই অস্ট্রীয় রাজবংশ। সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা সম্পূর্ণ অস্ট্রিয়ার রয়েছে —নাই শক্তি। তুর্ককে ইওরোপে 'আতুর বৃদ্ধ পুরুষ'[১] বলে; অস্ট্রিয়াকে 'আতুরা বৃদ্ধা স্ত্রী' বলা উচিত।

অস্ট্রিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত; সেদিন পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের নাম ছিল—'পবিত্র রোম সাম্রাজ্য'। বর্তমান জার্মানি প্রোটেস্টান্ট-প্রবল; অস্ট্রিয় সম্রাট চিরকাল পোপের দক্ষিণ হস্ত, অনুগত শিষ্য, রোমক সম্প্রদায়ের নেতা। এখন ইওরোপে ক্যাথলিক বাদশা কেবল এক অস্ট্রিয় সম্রাট; ক্যাথলিক সঙ্ঘের 'বড় মেয়ে' ফ্রান্স এখন প্রজাতন্ত্র; স্পেন পোর্তুগাল অধঃপাতিত! ইতালী পোপের সিংহাসনমাত্র স্থাপনের স্থান দিয়েছে; পোপের ঐশ্বর্য, রাজ্য, সমস্ত কেড়ে নিয়েছে; ইতালীর রাজা আর রোমের পোপে মুখ-দেখাদেখি নাই, বিশেষ শত্রুতা। পোপের রাজধানী রোম এখন ইতালীর রাজধানী; পোপের প্রাচীন প্রাসাদ দখল করে রাজা বাস করছেন; পোপের প্রাচীন ইতালীরাজ্য এখন পোপের ভ্যাটিকান (Vatican)- প্রাসাদের চতুঃসীমায় আবদ্ধ! কিন্তু পোপের ধর্মসম্বন্ধে প্রাধান্য এখনও অনেক—সে ক্ষমতার

১ The sick man of Europe

বিশেষ সহায় অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অথবা পোপ সহায় অস্ট্রিয়ার বহুকালব্যাপী দাসত্বের বিরুদ্ধে—নব্য ইতালীর অভ্যুত্থান। অস্ট্রিয়া কাজেই বিপক্ষ, ইতালী খুইয়ে বিপক্ষ। মাঝখান থেকে ইংলণ্ডের কুপরামর্শে নবীন ইতালী মহাসৈন্য-বল, রণপোত-বল সংগ্রহে বদ্ধপরিকর হল। সে টাকা কোথায়? ঋণজালে জড়িত হয়ে ইতালী উৎসন্ন যাবার দশায় পড়েছে; আবার কোথা হতে উৎপাত—আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার করতে গেল। হাবশি বাদশার কাছে হেরে, হতশ্রী হতমান হয়ে বসে পড়েছে। এ দিকে প্রুশিয়া মহাযুদ্ধে হারিয়ে অস্ট্রিয়াকে বহুদূর হঠিয়ে দিলে। অস্ট্রিয়া ধীরে ধীরে মরে যাচ্চে, আর ইতালী নব জীবনের অপব্যবহারে তদ্বৎ জালবদ্ধ হয়েছে।

অস্ট্রিয়ার রাজবংশের এখনও ইওরোপের সকল রাজবংশের অপেক্ষা গুমর! তাঁরা অতি প্রাচীন, অতি বড় বংশ! এ বংশের বে-থা বড় দেখেশুনে হয়। ক্যাথলিক না হলে সে বংশের সঙ্গে বে-থা হয়ই না। এই বড় বংশের ভাঁওতায় পড়ে মহাবীর ন্যাপোলঅঁর অধঃপতন!! কোথা হতে তাঁর মাথায় ঢুকলো যে, বড় রাজবংশের মেয়ে বে করে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন! যে বীব, 'আপনি কোন বংশে অবতীর্ণ'—এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, 'আমি কারু বংশের সন্তান নই, আমি মহাবংশের স্থাপক' অর্থাৎ আমা হতে মহিমান্বিত বংশ চলবে, আমি কোন পূর্বপুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্মাইনি, সেই বীরের এ বংশমর্যাদারূপ অন্ধকূপে পতন হল!

রাজ্ঞী জোসেফিনকে পরিত্যাগ, যুদ্ধে পরাজয় করে অস্ট্রিয়ার বাদশার কন্যা-গ্রহণ, মহা-সমারোহে অস্ট্রীয় রাজকন্যা মেরী লুইসের সহিত বোনাপার্টের বিবাহ, পুত্রজন্ম, সদ্যোজাত শিশুকে রোমরাজ্যে অভিষিক্তকরণ, ন্যাপোলঅঁর পতন, শ্বশুরের শত্রুতা, লাইপজিগ, ওয়াটারলু, সেন্ট হেলেনা, রাজ্ঞী মেরী লুইসের সপুত্র পিতৃগৃহে বাস, সামান্য সৈনিকের সহিত বোনাপার্ট-সম্রাজ্ঞীর বিবাহ, একমাত্র পুত্র রোমরাজের মাতামহ-গৃহে মৃত্যু— এ সব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা।

ফ্রান্স এখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থায় পড়ে প্রাচীন গৌরব স্মরণ করছে —আজকাল ন্যাপোলঅঁ-সংক্রান্ত পুস্তক অনেক। সার্দ[১] প্রভৃতি নাট্যকার গত ন্যাপোলঅঁ সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখেছেন; মাদাম বার্নহার্ড, রেজাঁ প্রভৃতি

১ Sardow

অভিনেত্রী কফেলাঁ প্রভৃতি অভিনেতাগণ সে সব পুস্তক অভিনয় করে প্রতি রাত্রে থিয়েটার ভরিয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি লেগলঁ[২], (গরুড়-শাবক) নামক এক পুস্তক অভিনয় করে মাদাম বার্নহার্ড প্যারিস নগরীতে মহা আকর্ষণ উপস্থিত করেছেন।

'গরুড়-শাবক' হচ্চে বোনাপার্টের একমাত্র পুত্র, মাতামহ-গৃহে ভিয়েনার প্রাসাদে এক রকম নজরবন্দী। অস্ট্রীয় বাদশার মন্ত্রী, চাণক্য মেটারনিক বালকের মনে পিতার গৌরবকাহিনী—যাতে একেবারে না স্থান পায়, সে বিষযে সদা সচেষ্ট। কিন্তু দুজন পাঁচজন বোনাপার্টেব পুরাতন সৈনিক নানা কৌশলে সানব্রান-প্রাসাদে (Schonbrunn Palace) অজ্ঞাতভাবে বালকেব ভৃত্যত্বে গৃহীত হল; তাদের ইচ্ছা—কোন রকমে বালককে ফ্রান্সে হাজির করা এবং সমবেত ইওরোপীয় বাজন্যগণ পুনঃস্থাপিত বুর্বঁ বংশকে তাড়িযে দিযে বোনাপার্ট-বংশ স্থাপন করা। শিশু মহাবীর-পুত্র; পিতার রণ- গৌরবকাহিনী শুনে সে সুপ্ত তেজ অতি শীঘ্রই জেগে উঠল। চক্রান্তকারীদেব সঙ্গে বালক সানব্রান-প্রাসাদ হতে একদিন পলায়ন করলে; কিন্তু মেটারনিকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি পূর্ব হতেই টের পেয়েছিল, সে যাত্রা বন্ধ করে দিলে। বোনাপার্ট-পুত্রকে সানব্রান-প্রাসাদে ফিরিয়ে আনলে—বদ্ধপক্ষ 'গরুড়-শিশু' ভগ্নহৃদযে অতি অল্পদিনেই প্রাণত্যাগ করলে!

এ সানব্রান-প্রাসাদ সাধারণ প্রাসাদ; অবশ্য ঘর-দোর খুব সাজানো বটে, কোন ঘরে খালি চীনের কাজ, কোন ঘরে খালি হিন্দু হাতের কাজ, কোন ঘরে অন্য দেশের—এই প্রকার; প্রাসাদস্থ উদ্যান অতি মনোরম বটে, কিন্তু এখন যত লোক এ প্রাসাদ দেখতে যাচ্চে, সব ঐ বোনাপার্ট-পুত্র যে ঘরে শুতেন, যে ঘরে পড়তেন, যে ঘরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল—সেই সব দেখতে যাচ্চে। অনেক আহাম্মক ফরাসী ফরাসিনী রক্ষীপুরুষকে জিজ্ঞাসা করছে, 'এগ্লঁ'র ঘব কোন্‌টা, কোন্ বিছানায় 'এগ্লঁ' শুতেন!! মর্ আহাম্মক, এরা জানে বোনাপার্টের ছেলে। এদের মেয়ে জুলুম করে কেড়ে নিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ, সে ঘৃণা এদের আজও যায় না। নাতি—রাখতে হয়, নিরাশ্রয়— রেখেছিল। তারা 'রোমরাজ' প্রভৃতি কোন উপাধিই দিত না; খালি অস্ট্রিয়াব নাতি—কাজেই ড্যুক, বস্। তাকে এখন তোরা 'গরুড়-শিশু' করে এক বই

২ L'aiglon (the Young Eagle)

লিখেছিস, তার উপর নানা কল্পনা জুটিয়ে, মাদাম বার্নহার্ডের প্রতিভায় একটা খুব আকর্ষণ হয়েছে; কিন্তু এ অস্ট্রীয় রক্ষী সে নাম কি করে জানবে বল? আর তার উপর সে-বইয়ে লেখা হয়েছে যে ন্যাপোলঅঁ-পুত্রকে অস্ট্রিয়ার বাদশা মেটারনিক মন্ত্রীর পরামর্শে একরকম মেরেই ফেললেন। রক্ষী—'এগলঁ' শুনে, মুখ হাঁড়ি করে, গজগজ করতে করতে ঘর-দোর দেখাতে লাগলো; কি করে, বকশিশটা ছাড়া বড়ই মুশকিল। তার উপর, এসব অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে সৈনিক বিভাগে বেতন নাই বললেই হল, এক রকম পেটভাতায় থাকতে হয়, অবশ্য কয়েক বৎসর পরে ঘরে ফিরে যায়। রক্ষীর মুখ অন্ধকার হয়ে স্বদেশপ্রিয়তা প্রকাশ করলে, হাত কিন্তু আপনা হতেই বকশিশের দিকে চলল। ফরাসীর দল রক্ষীর হাতকে রৌপ্য-সংযুক্ত করে, 'এগ্‌লঁ'র গল্প করতে করতে আর মেটারনিককে গাল দিতে দিতে ঘরে ফিরল; রক্ষী লম্বা সেলাম করে দোর বন্ধ করলে। মনে মনে সমগ্র ফরাসী জাতির বাপন্ত-পিতন্ত অবশ্যই করেছিল।

ভিয়েনা শহরে দেখবার জিনিস মিউজিয়ম, বিশেষ বৈজ্ঞানিক মিউজিয়ম। বিদ্যার্থীর বিশেষ উপকারক স্থান। নানাপ্রকার প্রাচীন লুপ্ত জীবের অস্থ্যাদি সংগ্রহ অনেক। চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে রূপ বার করবার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছর কতক ধরে এক ঝুড়ি মাছ এঁকেছে, না হয় এক থান মাংস, না হয় এক গ্লাস জল—সে মাছ, মাংস, গ্লাসে জল চমৎকার-জনক! কিন্তু ওলন্দাজ সম্প্রদায়ের মেয়ে-চেহারা সব যেন কুস্তিগির পালোয়ান!!

ভিয়েনা শহরে, জার্মান পাণ্ডিত্য বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু যে কারণে তুর্কী ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে গেল, সেই কারণে এথায়ও বর্তমান—অর্থাৎ নানা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ। আসল অস্ট্রিয়ার লোক জার্মান-ভাষী, ক্যাথলিক; হুঙ্গারির লোক তাতারবংশীয়, ভাষা আলাদা; আবার কতক গ্রীকভাষী, গ্রীকমতের ক্রিশ্চান। এ সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত করণের শক্তি অস্ট্রিয়ার নেই। কাজেই অস্ট্রিয়ার অধঃপতন!

বর্তমানকালে ইওরোপখণ্ডে জাতীয়তার এক মহাতরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতীয় সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যেথায় ঐ

প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্চে, সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্চে; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ। বর্তমান অস্ট্রীয় সম্রাটের মৃত্যুর পর অবশ্যই জার্মান অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের জার্মানভাষী অংশটুকু উদরসাৎ করবার চেষ্টা করবে, রুশ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে; মহা-আহবের সম্ভাবনা, বর্তমান সম্রাট অতি বৃদ্ধ—সে দুর্যোগ আশুসম্ভাবী। জার্মান সম্রাট তুর্কির সুলতানের আজকাল সহায়; সে সময়ে যখন জার্মানি অস্ট্রিয়া-গ্রাসে মুখ- ব্যাদান করবে, তখন রুশ-বৈরী তুর্ক, রুশকে কতক-মতক বাধা তো দেবে, কাজেই জার্মান সম্রাট তুর্কের সহিত বিশেষ মিত্রতা দেখাচ্ছেন।

ভিয়েনায় তিন দিন—দিক করে দিলে। প্যারিসের পর ইওরোপ দেখা—চর্ব্য-চূষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা; সেই কাপড়চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, সেই সব এক ঢঙ, দুনিয়াসুদ্ধ সেই এক কিম্ভূত কালো জামা, সেই এক বিকট টুপি! তার উপর—উপরে মেঘ আর নিচে পিল্ পিল্ করছে এই কালো টুপি, কালো জামার দল; দম যেন আটকে দেয়। ইওরোপ সুদ্ধ সেই এক পোশাক, সেই এক চাল-চলন হয়ে আসছে! প্রকৃতির নিয়ম—ঐ সবই মৃত্যুর চিহ্ন! শত শত বৎসর কসরত করিয়ে আমাদের আর্যেরা আমাদের এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন যে, আমরা এক ঢঙে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি ইত্যাদি; ফল—আমরা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রগুলি হয়ে গেছি; প্রাণ বেরিয়ে গেছে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্চি! যন্ত্রে 'না' বলে না, 'হাঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ'— (বাপ দাদা যে দিক দিয়ে গেছে) সে দিকে চলে যায়, তারপর পচে মরে যায়। এদেরও তাই হবে! 'কালস্য কুটিলা গতি'—সব এক পোশাক, এক খাওয়া এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি—হতে হতে ক্রমে সব যন্ত্র, ক্রমে সব 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' হবে, তারপর পচে মরা!!

২৮ অক্টোবর রাত্রি ৯টার সময় সেই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ট্রেন আবার ধরা হল। ৩০ অক্টোবর ট্রেন পৌঁছুল কনস্টান্টিনোপলে। এ দু-রাত একদিন ট্রেন চলল হুঙ্গারি, সর্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে। হুঙ্গারির অধিবাসী অস্ট্রীয় সম্রাটের প্রজা। কিন্তু অস্ট্রীয় সম্রাটের উপাধি 'অস্ট্রীয়ার সম্রাট ও হুঙ্গারির রাজা'। হুঙ্গারির লোক এবং তুর্কিরা একই জাত, তিব্বতির কাছাকাছি। হুঙ্গাররা কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইওরোপে প্রবেশ করেছে, আর তুর্করা

আস্তে আস্তে পারস্যের পশ্চিম প্রান্ত হয়ে আশিয়া-মিন[১] হয়ে ইওরোপ দখল করেছে। হুঙ্গারির লোক ক্রিশ্চান, তুর্ক মুসলমান। কিন্তু সে তাতার রক্তের যুদ্ধপ্রিয়তা উভয়েই বিদ্যমান। হুঙ্গাররা অস্ট্রিয়া হতে তফাত হবার জন্য বারংবার যুদ্ধ করে এখন কেবল নামমাত্র একত্র। অস্ট্রীয় সম্রাট নামে হুঙ্গারির রাজা। এদের রাজধানী বুডাপেস্ত অতি পরিষ্কার সুন্দর শহর। হুঙ্গার জাতি আনন্দপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়—প্যারিসের সর্বত্র হুঙ্গারিয়ান ব্যাণ্ড।

১ Asia Minor

তুরস্ক

সর্বিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি তুর্কির জেলা ছিল—রুশযুদ্ধের পর প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ; তবে সুলতান এখনও বাদশা, এবং সর্বিয়া-বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন অধিকার নেই। ইওরোপে তিন জাত সভ্য—ফরাসী, জার্মান আর ইংরেজ। বাকিদের দুর্দশা আমাদের মতো, অধিকাংশ এত অসভ্য যে, এশিয়ায় এত নীচ কোনও জাত নেই। সর্বিয়া-বুলগেরিয়াময় সেই মেটে ঘর, ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা মানুষ, আবর্জনারাশি—মনে হয় বুঝি দেশে এলুম! আবার ক্রিশ্চান কিনা—দু-চারটা শুয়োর অবশ্যই আছে। দুশো অসভ্য লোকে যা ময়লা করতে পারবে না, একটা শোরে তা করে দেয়। মেটে ঘর, তার মেটে ছাদ, ছেঁড়া ন্যাতা-চোতা পরনে, শূকরসহায় সর্বিয়া বা বুলগার! বহু রক্তস্রাবে, বহু যুদ্ধের পর, তুর্কের দাসত্ব ঘুচেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষম উৎপাত—ইওরোপী ঢঙে ফৌজ গড়তে হবে, নইলে কারু একদিনও নিস্তার নেই। অবশ্য দু-দিন আগে বা পরে ওসব রুশের উদরসাৎ হবে, কিন্তু তবুও সে দু-দিন জীবন অসম্ভব—ফৌজ বিনা! 'কনস্‌-ক্রিপশন্‌' চাই।

কুক্ষণে ফ্রান্স জার্মানির কাছে পরাজিত হল। ক্রোধে আর ভয়ে ফ্রান্স দেশসুদ্ধ লোককে সেপাই করলে। পুরুষমাত্রকেই কিছুদিনের জন্য সেপাই হতে হবে—যুদ্ধ শিখতে হবে; কারু নিস্তার নেই। তিন বৎসর বারিকে (barrack) বাস করে—ক্রোড়পতির ছেলে হোক না কেন, বন্দুক ঘাড়ে যুদ্ধ শিখতে হবে। গবর্নমেন্ট খেতে পরতে দেবে, আর বেতন রোজ এক পয়সা। তারপর তাকে দু-বৎসর সদা প্রস্তুত থাকতে হবে নিজের ঘরে; তারপর আরও ১৫ বৎসর তাকে দরকার হলেই যুদ্ধের জন্য হাজির হতে হবে। জার্মানি সিঙ্গি খেপিয়েছে—তাকেও কাজেকাজেই তৈয়ার হতে হল; অন্যান্য দেশেও এর ভয়ে ও, ওর ভয়ে এ—সমস্ত ইওরোপময় ঐ কনস্‌ক্রিপশন্‌, এক ইংলণ্ড ছাড়া। ইংলণ্ড দ্বীপ, জাহাজ ক্রমাগত বাড়াচ্চে; কিন্তু এ বোয়ার যুদ্ধের শিক্ষা পেয়ে বোধ হয় কনস্‌ক্রিপশন্‌ই বা হয়। রুশের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে অধিক, কাজেই রুশ সকলের চেয়ে বেশি ফৌজ খাড়া করে দিতে পারে। এখন এই যে সর্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ-সব তুর্কিকে

ভেঙে ইওরোপীরা বানাচ্চে, তাদের জন্ম না হতে হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত সুসজ্জিত ফৌজ তোপ প্রভৃতি চাই; কিন্তু আখেরে সে পয়সা যোগায় কে? চাষা কাজেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েছে—আর শহরে দেখবে কতকগুলো ঝাব্বাঝুব্বা পরে সেপাই। ইওরোপময় সেপাই, সেপাই—সর্বত্রই সেপাই। তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি আর এক; পরে যদি জোর করে করায় তো অতি ভাল কাজও করতে ইচ্ছা যায় না। (নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ।) গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। ইওরোপের লোকেরা ঐ সর্বিয়া, বুলগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে—তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি এক দিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বইকি—দু-শ করবে; করে শিখবে, শিখে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি-দুর্বল সবল হয়, অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।

রেলগাড়ি হুঙ্গারি, রোমানী[১] প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে চলল। মৃতপ্রায় অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যে যে সব জাতি বাস করে, তাদের মধ্যে হুঙ্গারিয়ানে জীবনীশক্তি এখনও বর্তমান। যাকে ইওরোপীয় মনীষিগণ ইন্দো-ইওরোপিয়ান বা আর্যজাতি বলেন, ইওরোপে দু-একটি ক্ষুদ্র জাতি ছাড়া আর সমস্ত জাতি সেই মহাজাতির অন্তর্গত। যে দু-একটা জাতি সংস্কৃত-সম ভাষা বলে না, হুঙ্গারিয়ানরা তাদের অন্যতম। হুঙ্গারিয়ান আর তুর্কী একই জাতি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এই মহাপ্রবল জাতি এশিয়া ও ইওরোপখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

যে দেশকে এখন তুর্কীস্থান বলে, পশ্চিমে হিমালয় ও হিন্দুকোশ পর্বতের উত্তরে স্থিত সেই দেশই এই তুর্কী জাতির আদি নিবাসভূমি। ঐ দেশেব তুর্কী নাম 'চাগওই'। দিল্লীর মোগলবাদশাহ-বংশ, বর্তমান পারস্য-রাজবংশ, কনস্টান্টিনোপলপতি তুর্কবংশ, ও হুঙ্গারিয়ান জাতি—সকলেই সেই 'চাগওই' দেশ হতে ক্রমে ভারতবর্ষ আরম্ভ করে ইওরোপ পর্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করেছে এবং আজও এই সকল বংশ আপনাদের 'চাগওই' বলে পরিচয় দেয় এবং এক ভাষায় কথাবার্তা কয়। এই তুর্কীরা বহুকাল পূর্বে অবশ্য

---

১ Rumania

অসভ্য ছিল। ভেড়া ঘোড়া গরুর পাল সঙ্গে, স্ত্রী-পুত্র ডেরা-ডাণ্ডা সমেত, যেখানে পশুপালের চরাবার উপযোগী ঘাস পেত, সেইখানে তাঁবু গেড়ে কিছু দিন বাস করত। ঘাস-জল সেখানকার ফুরিয়ে গেলে অন্যত্র চলে যেত। এখনও এই জাতির অনেক বংশ মধ্য এশিয়াতে এইভাবেই বাস করে। মোগল প্রভৃতি মধ্য-এশিয়াস্থ জাতিদের সহিত এদের ভাষাগত সম্পূর্ণ ঐক্য—আকৃতিগত কিছু তফাত, মাথার গড়নে ও হনুর উচ্চতায় তুর্কের মুখ মোগলের সমাকার, কিন্তু তুর্কের নাক খ্যাঁদা নয়, অপিচ সুদীর্ঘ চোখ সোজা এবং বড়, কিন্তু মোগলদের মতো দুই চোখের মাঝে ব্যবধান অনেকটা বেশি। অনুমান হয় যে, বহুকাল হতে এই তুর্কী জাতির মধ্যে আর্য এবং সেমিটিক রক্ত প্রবেশ লাভ করেছে; সনাতন কাল হতে এই তুরস্ক জাতি বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। আর এই জাতির সহিত সংস্কৃতভাষী, গান্ধারী ও ইরানিদের মিশ্রণে—আফগান, খিলজি, হাজারা, বরকজাই, ইউসাফজাই প্রভৃতি যুদ্ধপ্রিয়, সদা রণোন্মত্ত, ভারতবর্ষের নিগ্রহকারী জাতিসকলের উৎপত্তি। অতি প্রাচীনকালে এই জাতি বারংবার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তরস্থ দেশসকল জয় করে বড় বড় রাজ্য সংস্থাপন করেছিল। তখন এরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, অথবা ভারতবর্ষ দখল করবার পর বৌদ্ধ হয়ে যেত। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে হুষ্ক, যুষ্ক, কনিষ্ক নামক তিন প্রসিদ্ধ তুরস্ক সম্রাটের কথা আছে; এই কনিষ্কই 'মহাযান' নামে উত্তরাম্নায় বৌদ্ধধর্মের সংস্থাপক।

বহুকাল পরে ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্য-এশিয়াস্থ গান্ধার, কাবুল প্রভৃতি প্রধান প্রধান কেন্দ্রসকল একেবারে উৎসন্ন করে দেয়। মুসলমান হওয়ার পূর্বে এরা যখন যে দেশ জয় করত, সে দেশের সভ্যতা বিদ্যা গ্রহণ করত; এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যাবুদ্ধি আকর্ষণ করে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করত। কিন্তু মুসলমান হয়ে পর্যন্ত এদের যুদ্ধপ্রিয়তাটুকুই কেবল বর্তমান; বিদ্যা ও সভ্যতার নামগন্ধ নেই, বরং যে দেশ জয় করে, সে দেশের সভ্যতা ক্রমে ক্রমে নিভে যায়। বর্তমান আফগান, গান্ধার প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে তাদের বৌদ্ধ পূর্বপুরুষদের নির্মিত অপূর্ব স্তূপ, মঠ, মন্দির, বিরাট মূর্তি-সকল বিদ্যমান। তুর্কী-মিশ্রণ ও মুসলমান হবার ফলে সে সকল মন্দিরাদি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আধুনিক আফগান প্রভৃতি এমন অসভ্য মূর্খ হয়ে গেছে যে, সে সকল প্রাচীন স্থাপত্য নকল করা দূরে থাকুক, জিন প্রভৃতি অপদেবতাদের নির্মিত বলে

বিশ্বাস করে এবং মানুষের যে অত বড় কারখানা করা সাধ্য নয়, তা স্থির ধারণা করেছে।

বর্তমান পারস্য দেশের দুর্দশার প্রধান কারণ এই যে, রাজবংশ হচ্ছে প্রবল অসভ্য তুর্কীজাতি ও প্রজারা হচ্ছে অতি সুসভ্য আর্য—প্রাচীন পারস্য জাতির বংশধর। এই প্রকারে সুসভ্য আর্যবংশোদ্ভব গ্রীক ও রোমকদিগের শেষ রঙ্গভূমি কনস্টান্টিনোপল সাম্রাজ্য মহাবল বর্বর তুরস্কের পদতলে উৎসন্ন গেছে। কেবল ভারতবর্ষের মোগল বাদশারা এ নিয়মের বহির্ভূত ছিল—সেটা বোধ হয় হিন্দু ভাব ও রক্ত-সংমিশ্রণের ফল। রাজপুত বারট ও চারণদের ইতিহাস গ্রন্থে ভারত-বিজেতা সমস্ত মুসলমান বংশই তুরস্ক নামে অভিহিত। এ অভিধানটি বড় ঠিক, কারণ ভারতবিজেতা মুসলমান- বাহিনীচয় যে-কোন জাতিতেই পরিপূর্ণ থাক না কেন, নেতৃত্ব সর্বদা এই তুরস্ক জাতিতেই ছিল।

বৌদ্ধধর্মত্যাগী মুসলমান তুরস্কদের নেতৃত্বে—বৌদ্ধ বা বৈদিক ধর্মত্যাগী তুরস্কাধীন এবং তুরস্কের বাহুবলে মুসলমানকৃত হিন্দুজাতির অংশবিশেষের দ্বারা পৈতৃক ধর্মে স্থিত অপর বিভাগদের বারংবার বিজয়ের নাম 'ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ, জয় ও সাম্রাজ্য-সংস্থাপন'। এই তুরস্কদের ভাষা অবশ্যই তাদের চেহারার মতো বহু মিশ্রিত হয়ে গেছে, বিশেষতঃ যে সকল দল মাতৃভূমি চাগওই হতে যত দূরে গিয়ে পড়েছে, তাদের ভাষা তত মিশ্রিত হয়ে গেছে। এবার পারস্যের শা প্যারিস প্রদর্শনী দেখে কনস্টান্টিনোপল হয়ে রেলযোগে স্বদেশে গেলেন। দেশকালের অনেক ব্যবধান থাকলেও, সুলতান ও শা সেই প্রাচীন তুর্কী মাতৃভাষায় কথোপকথন করলেন। তবে সুলতানের তুর্কী—ফার্সী, আরবী ও দু-চার গ্রীক শব্দে মিশ্রিত; শা-র তুর্কী —অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ।

প্রাচীনকালে এই চাগওই-তুরস্কের দুই দল ছিল। এক দলের নাম 'সাদা-ভেড়া'র দল, আর এক দলের নাম 'কালো-ভেড়া'র দল। দুই দলই জন্মভূমি কাশ্মীরের উত্তর ভাগ হতে ভেড়া চরাতে চরাতে ও দেশ লুটপাট করতে করতে ক্রমে কাস্পিয়ান হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হল। সাদা ভেড়ারা কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইওরোপে প্রবেশ করলে এবং ধ্বংসাবশিষ্ট

রোমরাজ্যের এক টুকরো নিয়ে হুঙ্গারি নামক রাজ্য স্থাপন করলে। কালো-ভেড়ারা কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ দিয়ে ক্রমে পারস্যের পশ্চিমভাগ অধিকার করে, ককেশাস পর্বত উল্লঙ্ঘন করে, ক্রমে আশিয়া- মিনর প্রভৃতি আরবদের রাজ্য দখল করে বসল ; ক্রমে খলিফার সিংহাসন অধিকার করলে ; ক্রমে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু উদরসাৎ করলে। অতি প্রাচীনকালে এই তুরস্ক জাতি বড় সাপের পূজা করত। বোধ হয় প্রাচীন হিন্দুরা এদেরই নাগ-তক্ষকাদি বংশ বলত। তারপর এরা বৌদ্ধ হয়ে যায় ; পরে যখন যে দেশ জয় করত, প্রায় সেই দেশের ধর্মই গ্রহণ করত। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে—যে দু-দলের কথা আমরা বলছি, তাদের মধ্যে সাদা-ভেড়ারা ক্রিশ্চানদের জয় করে ক্রিশ্চান হয়ে গেল, কালো-ভেড়ারা মুসলমানদের জয় করে মুসলমান হয়ে গেল। তবে এদের ক্রিশ্চানী বা মুসলমানীতে—অনুসন্ধান করলে—নাগপূজার স্তর এবং বৌদ্ধ স্তর এখনও পাওয়া যায়।

হুঙ্গারিয়ান জাতি এবং ভাষায় তুরস্ক হলেও ধর্মে ক্রিশ্চান—রোমান ক্যাথলিক। সেকালে ধর্মের গোঁড়ামি—ভাষা, রক্ত, দেশ প্রভৃতি কোন বন্ধনী মানত না। হুঙ্গারিয়ানদের সাহায্য না পেলে অস্ট্রিয়া প্রভৃতি ক্রিশ্চান রাজ্য অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হত না। বর্তমানকালে বিদ্যার প্রচার, ভাষাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা রক্তগত ও ভাষাগত একত্বের উপর অধিক আকর্ষণ হচ্চে ; ধর্মগত একত্ব ক্রমে শিথিল হয়ে যাচ্চে। এইজন্য কৃতবিদ্য হুঙ্গারিয়ান ও তুরস্কদের মধ্যে একটা স্বজাতীয়ত্ব-ভাব দাঁড়াচ্চে।

অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও হুঙ্গারি বারংবার তা হতে পৃথক্ হবার চেষ্টা করেছে। অনেক বিপ্লব-বিদ্রোহের ফলে এই হয়েছে যে হুঙ্গারি এখন নামে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ আছে বটে, কিন্তু কার্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অস্ট্রীয় সম্রাটের নাম 'অস্ট্রিয়ার বাদশা ও হুঙ্গারির রাজা'। হুঙ্গারির সমস্ত আলাদা, এবং এখানে প্রজাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ। অস্ট্রীয় বাদশাকে এখানে নামমাত্র নেতা করে রাখা হয়েছে, এটুকু সম্বন্ধও বেশি দিন থাকবে বলে বোধ হয় না। তুর্কী-স্বভাবসিদ্ধ রণকুশলতা, উদারতা প্রভৃতি গুণ হুঙ্গারিয়ানে প্রচুর

বিদ্যমান। অপিচ মুসলমান না হওয়ায়—সঙ্গীতাদি দেবদুর্লভ শিল্পকে শয়তানের কুহক বলে না ভাবার দরুন সঙ্গীত-কলায় হুঙ্গারিয়ানরা অতি কুশলী ও ইওরোপময় প্রসিদ্ধ।

পূর্বে আমার বোধ ছিল, ঠাণ্ডা দেশের লোক লঙ্কার ঝাল খায় না, ওটা কেবল উষ্ণপ্রধান দেশের কদভ্যাস। কিন্তু যে লঙ্কা খাওয়া হুঙ্গারিতে আরম্ভ হল ও রোমানী বুলগারী প্রভৃতিতে সপ্তমে পৌঁছল, তার কাছে বোধ হয় মাদ্রাজীও হার মেনে যায়।

পরিব্রাজকের ডায়েরী—সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট

(১) কনস্টান্টিনোপল

কনস্টান্টিনোপলের প্রথম দৃশ্য রেল হতে পাওয়া গেল। প্রাচীন শহর—পগার (পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়েছে), অলিগলি, ময়লা, কাঠের বাড়ি ইত্যাদি, কিন্তু ঐ সকলে একটা বিচিত্রতাজনিত সৌন্দর্য আছে। স্টেশনে বই নিয়ে বিষম হাঙ্গামা। মাদ্‌মোয়াজেল কালভে ও জুল বোওয়া ফরাসী ভাষায় চুঙ্গীর কর্মচারীদের ঢের বুঝালে, ক্রমে উভয় পক্ষের কলহ। কর্মচারীদের 'হেড অফিসার' তুর্ক, তার খানা হাজির—কাজেই ঝগড়া অল্পে অল্পে মিটে গেল, সব বই দিলে—দুখানা দিলে না। বললে, 'এই হোটেলে পাঠাচ্ছি'— সে আর পাঠানো হল না। স্তাম্বুল বা কনস্টান্টিনোপলের শহর বাজার দেখা গেল। 'পোন্ট' (Pont) বা সমুদ্রের খাড়ি-পারে 'পেরা' (Pera) বা বিদেশীদিগের কোয়ার্টার, হোটেল ইত্যাদি—সেখান হতে গাড়ি করে শহর বেড়ানো ও পরে বিশ্রাম। সন্ধ্যার পর উড্‌স্ পাশার দর্শনে গমন। পরদিন বোট চড়ে বাস্ফোর ভ্রমণে যাত্রা। বড্ড ঠাণ্ডা, জোর হাওয়া, প্রথমে স্টেশনেই আমি আর মিস ম্যা—নেবে গেলাম। সিদ্ধান্ত হল—ওপারে স্কুটারিতে গিয়ে পেয়র হিয়াসান্থের সঙ্গে দেখা করা। ভাষা না জানায় বোটভাড়া ইঙ্গিতে করে পারে গমন ও গাড়ি ভাড়া। পথে সুফি ফকিরের 'তাকিয়া' দর্শন, এই ফকিরেরা লোকের রোগ ভাল করে। তার প্রথা এইরূপ —প্রথম কল্‌মা পড়া ঝুঁকে ঝুঁকে, তারপর নৃত্য, তারপর ভাব, তারপর রোগ আরাম—রোগীর শরীর মাড়িয়ে দিয়ে।

পেয়ার হিয়াসান্থের সঙ্গে আমেরিকান কলেজ-সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তা। আরবের দোকান ও বিদ্যার্থী টর্ক (Turkish student) দর্শন। স্কুটারি হতে প্রত্যাবর্তন। নৌকা খুঁজে পাওয়া—সে কিন্তু ঠিক জায়গায় যেতে না-পারক। যা হোক, যেখানে নাবালে সেইখান হতেই ট্রামে করে ঘরে (স্তাম্বুলের *হোটেলে) ফেরা। মিউজিয়ম—স্তাম্বুলের যেখানে প্রাচীন অন্দরমহল্* ছিল গ্রীক বাদশাদের—সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত। অপূর্ব sarcophagi (শবদেহ রক্ষা

করবার প্রস্তর-নির্মিত আধার) ইত্যাদি দর্শন। তোপখানার (Tophaneh) উপর হতে শহরের মনোহর দৃশ্য। অনেক দিন পরে এখানে ছোলাভাজা খেয়ে আনন্দ। তুর্কি পোলাও কাবাব ইত্যাদি এখানকার খাবার ভোজন। স্কুটারির কবরখানা। প্রাচীন পাঁচিল দেখতে যাওয়া। পাঁচিলের মধ্যে জেল—ভয়ঙ্কর। উড্‌স্ পাশার সহিত দেখা ও বাস্ফোর যাত্রা। ফরাসী পররাষ্ট্রসচিবের (Chargc-d' Affaires) অধীনস্থ কর্মচারীর সহিত ভোজন (dinner)—জনৈক গ্রীক পাশা ও একজন আলবানি ভদ্রলোকের সহিত দেখা। পেযর হিয়াসাম্থের লেকচার পুলিস বন্ধ করেছে, কাজেই আমার লেকচারও বন্ধ। দেবন্‌মল ও চোবেজীর (একজন গুজরাতি বামুন) সহিত সাক্ষাৎ। এখানে হিন্দুস্থানী, মুসলমান ইত্যাদি অনেক ভারতবর্ষীয় লোক আছে। তুর্কী ফিললজি। নুর বের (Noor Bey) কথা—তার ঠাকুরদাদা ছিল ফরাসী। এরা বলে, কাশ্মীরীর মত সুন্দর! এখানকার স্ত্রীলোকদিগের পরদাহীনতা। বেশ্যাভাব মুসলমানি। খুর্দ পাশা আর্মানি (Arian ?) ও আরমিনিয়ান হত্যার কথা শুনেছি। আরমিনিয়ানদের বাস্তবিক কোন দেশ নাই। যে সব স্থানে তারা বাস করে, সেথায় মুসলমানই অধিক। আরমিনিয়া বলে কোন স্থান অজ্ঞাত। বর্তমান সুলতান খুর্দদের হামিদিয়ে রেসল্লা (Hamidian cavelry) তৈরী করছেন, তাদের কজাকদের (Cossacks) মতো শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তারা conscription হতে খালাস হবে।

বর্তমান সুলতান, আরমিনিয়ান এবং গ্রীক পেট্রিয়ার্কদের ডেকে বলেন যে, তোমরা tax (টেক্স) না দিয়ে সেপাই হও (conscription), তোমাদের জন্মভূমি রক্ষা কর। তাতে তারা জবাব দেয় যে, ফৌজ হয়ে লড়ায়ে গিয়ে মুসলমান সিপাইদের সহিত একত্র মলে ক্রিশ্চান সিপাইদের কবরের গোলমাল হবে। উত্তরে সুলতান বলেন যে প্রত্যেক পল্টনে না হয় মোল্লা ও ক্রিশ্চান পাদ্রী থাকবে, এবং লড়ায়ে যখন ক্রিশ্চান ও মুসলমান ফৌজের শবদেহসকল একত্র এক গাদায় কবরে পুঁততে বাধ্য হবে, তখন না হয় দুই ধর্মের পাদ্রীই শ্রাদ্ধমন্ত্র (funeral service) পড়ল; না হয় এক ধর্মের লোকের আত্মা, বাড়ার ভাগ অন্য ধর্মের শ্রাদ্ধমন্ত্রগুলো শুনে নিলে। ক্রিশ্চানরা রাজি হল না—কাজেই তারা tax (টেক্স) দেয়। তাদের রাজি না হবার ভেতর কারণ হচ্ছে, ভয় যে মুসলমানের সঙ্গে একত্র বসবাস করে পাছে সব মুসলমান হয়ে যায়। বর্তমান স্তাম্বুলের বাদশা বড়ই ক্লেশসহিষ্ণু —প্রাসাদে থিয়েটার ইত্যাদি

আমোদ-প্রমোদ পর্যন্ত সব কাজ নিজে বন্দোবস্ত করেন। পূর্ব-সুলতান মুরাদ বাস্তবিক নিতান্ত অকর্মণ্য ছিল—এ বাদশা অতি বুদ্ধিমান। যে অবস্থায় ইনি রাজ্য পেয়েছিলেন, তা থেকে এত সামলে উঠেছেন যে আশ্চর্য! পার্লামেন্ট হেথায় চলবে না।

(২) এথেন্স, গ্রীস

বেলা দশটার সময় কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ। এক রাত্রি এক দিন সমুদ্রে। সমুদ্র বড়ই স্থির। ক্রমে Golden Horn (সুবর্ণ শৃঙ্গ) ও মারমোরা। দ্বীপপুঞ্জ মারমোরার একটিতে গ্রীক ধর্মের মঠ দেখলুম। এখানে পুরাকালে ধর্ম-শিক্ষার বেশ সুবিধা ছিল—কারণ একদিকে এশিয়া আর একদিকে ইওরোপ। মেডিটরেনি দ্বীপপুঞ্জ প্রাতঃকালে দেখতে গিয়ে প্রফেসার লেপরের সহিত সাক্ষাৎ, পূর্বে পাচিয়াপ্পার কলেজে মাদ্রাজে এঁর সহিত পরিচয় হয়। একটি দ্বীপে এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখলুম—নেপচুনের মন্দির আন্দাজ, কারণ—সমুদ্রতটে। সন্ধ্যার পর এথেন্স পৌঁছলুম। এক রাত্রি কারানটাইনে থেকে সকালবেলা নাববার হুকুম এল! বন্দর পাইরিউসটি (Peiraeus) ছোট শহর। বন্দরটি বড়ই সুন্দর, সব ইওরোপের ন্যায়, কেবল মধ্যে মধ্যে এক-আধ জন ঘাগরা-পরা গ্রীক। সেথা হতে পাঁচ মাইল গাড়ি করে শহরের প্রাচীন প্রাচীর, যাহা এথেন্সকে বন্দরের সহিত সংযুক্ত করত, তাই দেখতে যাওয়া গেল। তারপর শহর দর্শন—আক্রোপলিক, হোটেল, বাড়ি-ঘর-দোর অতি পরিষ্কার। রাজ-বাটীটি ছোট। সে দিনই আবার পাহাড়ের উপর উঠে আক্রোপলিস, বিজয়ার (Wingless Victory) মন্দির, পারথেনন ইত্যাদি দর্শন করা গেল। মন্দিরটিতে সাদা মর্মরের কয়েকটি ভগ্নাবশেষ স্তম্ভও দণ্ডায়মান দেখলুম। পরদিন পুনর্বার মাদ্‌মোয়াজেল মেলকাবির সহিত ঐ সকল দেখতে গেলাম—তিনি ঐ সকলের সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক কথা বুঝিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন ওলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, থিয়েটার ডাইওনিসিয়াস ইত্যাদি সমুদ্রতট পর্যন্ত দেখা গেল। তৃতীয় দিন এলুসি যাত্রা। উহা গ্রীকদের প্রধান ধর্মস্থান। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এলুসি-রহস্যের (Eleusinian Mysteries) অভিনয় এখানেই হত। এখানকার প্রাচীন থিয়েটারটি এক ধনী গ্রীক নূতন করে দিয়েছে। Olympian games-এর (অলিম্পিক খেলার)

পুনরায় বর্তমানকালে প্রচলন হয়েছে। সে স্থানটি স্পার্টার নিকট। তায় আমেরিকানরা অনেক বিষয়ে জেতে। গ্রীকরা কিন্তু সে স্থান হতে এথেন্সের এই থিয়েটার পর্যন্ত আসায় জেতে। তুর্কের কাছে ঐ গুণের (দৌড়ের) বিশেষ পরিচয়ও তারা এবার দিয়েছে। চতুর্থ দিন বেলা দশটার সময় রুশী স্টীমার জার'-আরোহণে ইজিপ্ত-যাত্রী হওয়া গেল। ঘাটে এসে জানলুম স্টীমার ছাড়বে ৪ টার সময়—আমরা বোধ হয় সকাল সকাল এসেছি অথবা মাল তুলতে দেরি হবে। অগত্যা ৫৭৬ হতে ৪৮৬ খ্রীঃ পূর্বে আবির্ভূত এজেলাদাস Ageladas) এবং তাঁর তিন শিষ্য ফিডিয়াস (Phidias), মিরন (Myron) ও পলিক্লেটের (Polycletus) ভাস্কর্যের কিছু পরিচয় নিয়ে আসা গেল। এখুনি খুব গরম আরম্ভ। রুশিয়ান জাহাজে স্ক্রুর উপর ফার্স্ট ক্লাস। বাকি সবটা ডেক—যাত্রী, গরু আর ভেড়ায় পূর্ণ! এ জাহাজে আবার বরফও নেই।

(৩) লুভার (Louvre) মিউজিয়মে

মিউজিয়ম দেখে গ্রীক কলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম। প্রথম 'মিসেনি' Mycenoean), দ্বিতীয় যথার্থ গ্রীক। আচেনি রাজ্য (Achaean) সন্নিহিত পপুঞ্জে অধিকার বিস্তার করেছিল, আর সেই সঙ্গে ঐ সকল দ্বীপে প্রচলিত, শিয়া হতে গৃহীত সমস্ত কলাবিদ্যারও অধিকারী হয়েছিল। এইরূপেই প্রথমে সে কলাবিদ্যার আবির্ভাব। অতি পূর্ব অজ্ঞাত কাল হতে খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ ৎসর যাবৎ 'মিসেনি' শিল্পের কাল। এই 'মিসেনি' শিল্প প্রধানতঃ এশিয়া ল্পের অনুকরণেই ব্যাপৃত ছিল। তারপর ৭৭৬ খ্রীঃ পূঃ কাল হতে ১৪৬ খ্রীঃ ঃ পর্যন্ত 'হেলেনিক' বা যথার্থ গ্রীক শিল্পের সময়। দোরিয়ন জাতির দ্বারা চেনি-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ইওরোপখণ্ডস্থ ও দ্বীপপুঞ্জনিবাসী গ্রীকরা শিয়াখণ্ডে বহু উপনিবেশ স্থাপন করলে। তাতে বাবিল ও ইজিপ্তের সহিত দের ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হল, তা হতেই গ্রীক আর্টের উৎপত্তি হয়, মে এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ-চেষ্টা খানকার শিল্পে জন্মে। গ্রীক আর অন্য প্রদেশের শিল্পের তফাত এই যে, ক শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যাথাতথ্য জীবন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা রছে।

খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ হতে খ্রীঃ পূঃ ৪৭৫ পর্যন্ত 'আর্কেইক' গ্রীক শিল্পের কাল এখনও মূর্তিগুলি শক্ত (stiff), জীবন্ত নয়। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদা হাসছে। এ বিষয়ে ঐগুলি ইজিপ্তের শিল্পিগঠিত মূর্তির ন্যায়। সব মূর্তিগুলি দু-পা সোজা করে, খাড়া (কাঠ) হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুল দাড়ি সম সরলরেখাকারে (regular lines) খোদিত; বস্ত্র সমস্ত মূর্তির গায়ের সং জড়ানো, তাল পাকানো—পতনশীল বস্ত্রের মত নয়।

'আর্কেইক' গ্রীক শিল্পের পরেই 'ক্লাসিক' গ্রীক শিল্পের কাল—৪৭৫ খ্রী পূঃ হতে ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত। অর্থাৎ এথেন্সের প্রভুত্বকাল হতে আরব্ধ হ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারকাল পিলোপনেশাস এবং আটিকা রাজ্যই এই সময়কার শিল্পের চরম উন্নতি-স্থান এথেন্স আটিকা রাজ্যেরই প্রধান শহর ছিল। কলাবিদ্যানিপুণ একজন ফরা পণ্ডিত লিখেছেন, "(ক্লাসিক) গ্রীক শিল্প, চরম উন্নতিকালে বিধিব প্রণালী-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কে দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রি করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যে কালে নির্মি হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যত আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিয়মের সম্ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হইয়া উঠে।" এই 'ক্লাসিক' গ্রীক শিে দুই সম্প্রদায়—প্রথম আটিক, দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়েন। আটিক সম্প্রদা আবার দুই প্রকার ভাবঃ প্রথম, মহাশিল্পী ফিডিয়াসের প্রতিভাবল। "অ সৌন্দর্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব, যাহা কোনকালে মানবম আপন অধিকার হারাইবে না"—এই বলে যাকে জনৈক ফরাসী পণ্ডিত নিে করেছেন। স্কোপাস আর প্র্যাক্সিটেলেস (Praxiteles) আটিক সম্প্রদাে দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক। এই সম্প্রদায়ের কার্য শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ একেবারে বিচ্যুত করে কেবলমাত্র মানুষের জীবন-বিবরণে নিযুক্ত রাখা।

'ক্লাসিক' গ্রীক শিল্পের পিলোপনেশিয়েন নামক দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্র শিক্ষক পলিক্লেটাস এবং লিসিপাস (Lysippus)। এঁদের একজন খ্রী পঞ্চম শতাব্দীতে এবং অন্যজন খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে

এঁদের প্রধান লক্ষ্য—মানবশরীরে গড়নপরিমাণের আন্দাজ (proportion) শিল্পে যথাযথ রাখবার নিয়ম প্রবর্তিত করা।

৩২৩ খ্রীঃ পূঃ হইতে ১৪৬ খ্রীঃ পূঃ কাল পর্যন্ত অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর হতে রোমানদিগের দ্বারা আটিকা-বিজয়কাল পর্যন্ত গ্রীক শিল্পের অবনতিকাল। জাঁকজমকের বেশি চেষ্টা এবং মূর্তিসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করবার চেষ্টা এই সময়ে গ্রীক শিল্পে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর রোমানদের গ্রীস অধিকার-সময়ে গ্রীক শিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব পূর্ব শিল্পীদের কার্যের নকল মাত্র করেই সন্তুষ্ট। আর নূতনের মধ্যে হুবহু কোন লোকের মুখ নকল করা।

তথ্যপঞ্জী

‘পরিব্রাজক’-প্রসঙ্গে ঃ

ব্যাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম মৌলিক গ্রন্থপ্রয়াস ‘বর্তমান ভারত’ এবং দ্বিতীয় প্রয়াস ‘পরিব্রাজক’ দুইটিই তাঁহার অনুপ্রেরণায় প্রকাশিত ‘উদ্বোধন’-পত্রিকার প্রথম বর্ষ হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথমবার পাশ্চাত্য হইতে ফিরিয়া আসার পর এদেশে তাঁহার আরব্ধ জাতীয় পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে বহুবিধ কর্মসাধনার মধ্যে বাংলাসাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ অন্যতম প্রধান ঘটনা। বাংলা ভাষাকে নূতন প্রতিভার স্পর্শে উজ্জীবিত করিবার সঙ্কল্প লইয়া তাঁহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদাহরণরূপে সাধু-গদ্যে রচিত ‘বর্তমান ভারত’ এবং চলতি-গদ্যে রচিত ‘পরিব্রাজক’—দুইটিই বাংলাসাহিত্যে স্থায়ী কীর্তিরূপে স্বীকৃত। ‘উদ্বোধনে’র দ্বিতীয় বর্ষ হইতে স্বামীজীর আর একটি অসামান্য গ্রন্থ ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ বাংলা গদ্যরীতির ক্ষেত্রে চলতি ভাষাকে চিরস্থায়ী মর্যাদা দান করে।

উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর অনুরোধে স্বামীজী তাঁহার দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যযাত্রার কাহিনী পত্ররচনার ভঙ্গিতে বিদেশ হইতে প্রেরণ করিতে থাকেন। সমগ্র গ্রন্থটি পত্ররচনার প্রত্যক্ষ সম্বোধনের পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত হওয়ায় উদ্দিষ্ট সম্পাদককে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র পাঠকসমাজের সহিত লেখকের অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপন করিয়াছে। অথচ সমগ্র গ্রন্থটিতে বক্তব্যপ্রবাহ এমনভাবে সুগ্রথিত যে পত্ররচনাপদ্ধতির কৃত্রিমতা এ গ্রন্থে কোথাও দেখা দেয় নাই। বস্তুতঃ বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনীরূপে ‘পরিব্রাজক’ স্বামীজীর সাহিত্যপ্রতিভার উজ্জ্বল উদাহরণ।

ভারত ও বহির্বিশ্বে পরিক্রমার দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দ যে বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছিলেন, এই ভ্রমণকাহিনীটিতে তিনি সে অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় পাঠকচিত্তকে বাঙলার গৃহকোণ হইতে বিশ্ব-ইতিহাস-পরিক্রমার আহ্বান করিয়াছেন। যে সৌন্দর্যদৃষ্টি, রসবোধ, মানবচরিত্র বিশ্লেষণের অন্তর্দৃষ্টি এবং চলমান জীবনধারার রূপায়ণ-দক্ষতা ভ্রমণকাহিনীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ‘পরিব্রাজকে’র আদ্যন্ত সেই সার্থক ভ্রমণসাহিত্য রচনার অসামান্য নিদর্শন। সৌন্দর্যদৃষ্টির উদাহরণরূপে হরিদ্বারে গঙ্গার বর্ণনা, হুগলী

নদীর তীরে তীরে চিরসবুজ বাঙলার প্রকৃতির চিত্ররূপ অথবা সমুদ্রবর্ণনা; বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও গভীরতার সঙ্গে তাঁহার আনন্দময় পরিহাস-বৈদগ্ধ্যের উদাহরণস্বরূপে 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র উদাহরণ, হাঙ্গর-শিকারের অপূর্ব বাণীচিত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে, বাংলা চলতি-গদ্যের সমকালীন পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের গদ্যরীতি যে কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বিশ্বপরিক্রমাকালে স্বামীজীর ইতিহাসসন্ধানী সত্তা বিভিন্ন সভ্যতার বিকাশ-কাহিনী সরস বর্ণনার দ্বারা পাঠকচিত্তকে তাৎক্ষণিক ভ্রমণ হইতে বিশ্ব-ইতিহাসের প্রাঙ্গণে উপস্থাপিত করিয়াছে। এই ইতিহাসবোধের মূলে তাঁহার অন্তরের অধিদেবতা জননী ভারতবর্ষ—কখনো দরিদ্র শ্রমজীবী, কখনো ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা জগদীশচন্দ্র বসু, কখনো পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রভৃতি নানা উপলক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিভিন্ন সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা স্বামীজী যে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার এই ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে পাঠকমণ্ডলীর কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন, বাংলাভাষায় গভীরতম মননের সরসতম প্রকাশরূপে তাহা সানন্দ বিস্ময়ে উপভোগ্য।

রচনাটি 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩০৫-০৬) পঞ্চদশ সংখ্যা হইতে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষে (১৩০৬-০৭) পঞ্চম সংখ্যা অবধি ইহা এই নামেই প্রকাশিত হয়। তৃতীয় বর্ষের (১৩০৭-০৮) প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যায় ইহার নাম হয় 'পরিব্রাজক'। নামকরণের এই পার্থক্যের মধ্য দিয়া সাধারণ বিলাত-যাত্রার কাহিনী হইতে অনেক ব্যাপকতর তাৎপর্যে গ্রন্থটি সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১ ১ 'মো'কারটা হৃষীকেশী ঢঙে উদাত্ত:

উত্তরভারতে হৃষীকেশের দিকে সন্ন্যাসীরা পারস্পরিক অভিবাদনকালে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া সম্বোধন করেন। 'নমো'-র 'মো' অংশটি খুব টানিয়া উচ্চারণ করা হয়।

১ ১০ 'ক্ব সূর্যপ্রভবো...বানরেন্দ্রঃ':

রঘুবংশের 'ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশ...' শ্লোকটির অনুসরণে রচিত।

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

১ ১৯ রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষঃ মাথায় লালচুল ও কটাচক্ষু শ্বেতাঙ্গ।

২ ১৮ কবি শ্যামাচরণঃ ঘরকুনো বাঙালীকে কটাক্ষ করা হইয়াছে।

২ ২৬ 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'ঃ (দ্রষ্টব্য নবম খণ্ড, পৃঃ ৫১৭)

৫ ৫ 'জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা'ঃ ব্রহ্মতেজে দীপ্ত।—কুমারসম্ভব, ৫।৩০

ছিলেন—নমো ব্রহ্মণে, হয়েছেন—নমো নারায়ণায়ঃ প্রথমটি ব্রাহ্মণকে, দ্বিতীয়টি সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিবার সময় বলা হয়; এখানে অর্থ—'ছিলেন ব্রাহ্মণ, হয়েছেন সন্ন্যাসী'।

৫ ১০ জহ্নুর কুটির ভাঙাঃ ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনীতে এই উপাখ্যানটি রহিয়াছে।

৫ ১৮ 'ঐ যে ঘরটি দেখছ'ঃ হিমঘর বা cold storage.

১০ ৫ অন্ধকূপের হলওয়েলঃ অন্ধকূপ হত্যার (Black Hole Tragedy) কাহিনী এখন ঐতিহাসিকগণ হলওয়েল সাহেবের মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া মনে করেন। হলওয়েল ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

১৪ ১০ ঊর্ধ্বমূলম্ঃ ভেলার একদিকে গাছের গুঁড়িগুলি একত্র বাঁধা থাকে—সেদিকটা উঁচু। তাই রহস্য করিয়া 'ঊর্ধ্বমূলম্' বলা হইয়াছে। কথাটি গীতার (১৫।১), সেখানে সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে 'ঊর্ধ্বমূলম্ অধঃশাখম্' অর্থাৎ উহার মূল ঊর্ধ্বে ভগবানে ও শাখাদি নিম্নে বিস্তৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

১৪ ২৬ মোহন্ত মহারাজঃ বেলুড় মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ।

১৬ ১৬ এখন আর 'প্রেস গ্যাঙ্গের' নামেঃ সেকালে ইংলণ্ডে (এবং ইউরোপের সকল দেশেই) সামরিক বাহিনীতে বলপূর্বক ও যথেচ্ছভাবে লোক নিয়োগ করা হইত। এই প্রথার নাম ছিল 'impressment' এবং ইহা প্রথমে রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতাবলে (Prerogative) এবং পরে পার্লামেন্টে আইন করিয়া কার্যকর করা হইত। সেনাবাহিনীতে

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

বলপূর্বক লোক নিযুক্ত করার প্রথা তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালের বহুলাংশে সীমাবদ্ধ হয়। ১৭৭৯ খ্রীঃ এক আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কেবল অলস দুর্বিনীত ও কর্মকুণ্ঠ লোকেরাই এইভাবে ধৃত এবং নিযুক্ত হইতে পারিবে। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে এই প্রথা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। নৌবাহিনীতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে মানুষ ধরিয়া আনিবার জন্য গভর্নমেণ্ট সশস্ত্র দঙ্গল (Press-gang) পাঠাইতেন। ইহাদের সঙ্গে সৈন্য পাঠানো হইত। দঙ্গলের লোকেরা রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম্য লোকের বাড়িতে অতর্কিতে প্রবেশ করিয়া মানুষ ধরিত। কৌশলে বা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে হোটেলে লইয়া গিয়া সেখানে ধরিত। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আরও নানারকমের অত্যাচার করিত।

১৭ ১ আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসের সিভিল ওয়ারের সময়ঃ আমেরিকার দক্ষিণাংশে অবস্থিত ৭টি রাষ্ট্র ১৮৬১ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে, এবং আরও চারিটি রাষ্ট্র কয়েক মাস পরে নিজেদের যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন এবং মার্কিনী রাষ্ট্র সমবায় (The Confederate States of America) নামে অভিহিত একটি নূতন রাষ্ট্রে পরিণত বলিয়া ঘোষণা করে। এই রাষ্ট্রগুলিতে দাসত্ব-প্রথা বলবৎ ছিল, এবং এই কারণে এই নীতিবিরোধী যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশের রাষ্ট্রগুলির সহিত উহাদের মনোমালিন্য বাড়িয়াই চলিতেছিল। এই প্রথার উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর আব্রাহাম লিঙ্কন (Abrahám Lincoln) ১৮৬০ খ্রীঃ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করিলে উহারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই লইয়া ১৮৬১ খ্রীঃ ১২ এপ্রিল গৃহযুদ্ধ (civil war) শুরু হয়।

১৭ ১৪ লুয়ার বাসর ঘরঃ লোহার বাসর ঘর (—মনসামঙ্গল)।

১৮ ২১ বারাখজাই, আফ্রিদঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তুর্ক-জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত পার্বত্য জাতি। ইহারা মুসলমান এবং ইহাদের নিশানা অব্যর্থ।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

২৪ ২৭ 'শিরদার তো সরদার' ঃ নেতৃত্ব করিতে হইলে নিজের মাথা আগে দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহা শিখজাতির অভ্যুদয়কালে অন্যতম প্রধান নীতি ছিল।

২৬ ৩৮ মমি ঃ প্রাচীন মিশরে মৃতদেহকে নানাপ্রকার আরক প্রভৃতি দ্বারা বহুকাল অবিকৃত রাখার কৌশল জানা ছিল; এই সকল দেহকে মমি বলা হয়।

২৬ ১১ তোমবা ভূতকাল—লুঙ লঙ লিট্ সব একসঙ্গে ঃ তোমরা সম্পূর্ণ অতীতের বস্তু। অতীতকালবাচক সব কয়টি বিভক্তির সমষ্টি।

২৬ ১৩ ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ—লোপ লুপ্ ঃ ব্যাকবণের 'ইৎ'-শব্দের অর্থ অস্থাযী অংশ; ইহা বিশেষ' উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, কার্যসিদ্ধির পর আর থাকে না। 'ইৎ'-এব লোপ হয়। স্বামীজী বলিতেছেন, তোমাদেরও থাকিবাব উদ্দেশ্য শেষ হইযাছে—আব প্রয়োজন নাই।

২৭ ২৯ 'ওয়াহ গুরু কি ফতে' ঃ গুরুগোবিন্দ সিংহ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত খালসাদিগের জয়ধ্বনি; ইহার অর্থ—গুরুজীর জয়।

২৭ ১৮ গঞ্জালেজ ঃ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত গঞ্জালেজ পলায়ন কবিযা বাঙলাব দক্ষিণ উপকূলে মাধবপাশার রাজা রামচন্দ্রের সহাযতায় সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া তথায় নিজেই স্বাধীন রাজা হইয়া বসে। পোর্তুগীজ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ সে সময় এই সকল অঞ্চলে ক্রীতদাসের ব্যবসায় ও লুঠতরাজে লিপ্ত থাকিত।

২৮ ১৯ রামানুজী তিলক ঃ রামানুজী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ প্রকাণ্ড তিলক ব্যবহার করেন।

২৮ ২১ সাগরেদ রামানন্দী তিলক ঃ কবীরের গুরু রামানন্দ, রামানুজী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

২৯ ৯ মধ্বমুনি ঃ মধ্বাচার্য, দ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য।

২৯ ১১ রামসনেহী ঃ শ্রীরামচরণ নামক সাধক এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৭৬ সম্বতে জয়পুরের অন্তর্গত সুবাসেন গ্রামে তাঁহার জন্ম। রামায়েত বৈষ্ণব হইলেও ইনি প্রতিমাপূজার বিরোধী ছিলেন।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

এজন্য সে-যুগে তাঁহাকে অনেক জায়গায় লাঞ্ছিত হইতে হয়। অবশেষে শাহপুরের অধিপতি ভীমসিংহ তাঁহাকে আশ্রয় দেন। এই শাহপুরেই রামসনেহী সম্প্রদায় গড়িয়া ওঠে। [দ্রষ্টব্যঃ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (১ম ভাগ)—অক্ষয়কুমার দত্ত]।

২৯ ২২ সায়ণঃ বেদের ভাষ্যকার বিদ্যারণ্য মুনি। (দ্রষ্টব্য নবম খণ্ড, পৃঃ ৫০১)।

২৯ ২২ 'পঞ্চদশী'ঃ (দ্রষ্টব্য নবম খণ্ড, পৃঃ ৫০৫)।

২৯ ২৩ তামিল জাতিঃ দক্ষিণভারতের অধিবাসিগণের এবং ভাষাসমূহের সংস্কৃতে সাধারণ নাম 'তামিল'। ক্যালডোয়েল (Bishop Caldwell) সাহেবের মতে দ্রাবিড়, দ্রামিল, দামিল—এইরূপ বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়া পরিশেষে 'তামিল' শব্দটি আসিয়াছে। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর 'আর্য ও তামিল জাতি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (এই গ্রন্থাবলীর পঞ্চম খণ্ডে)।

৩০ ৫ শঠকোপঃ আলবার বা তামিল দেশীয় বৈষ্ণব-ভক্ত।

৩২ ৪ সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনেঃ
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত 'মন চল নিজ নিকেতনে'র একটি অসম্পূর্ণ চরণ।

৩৩ ৪ সেতুপতি মহারাজঃ রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি।

৩৩ ৩ মহাদুষ্টু বাঙালী রাজার ছেলে—বিজয়সিংহঃ
'দীপবংশ' ও 'মহাবংশ' নামক দুই সিংহলী ইতিবৃত্ত অনুসারে সিংহল দ্বীপের সর্বপ্রথম আর্য অভিবাসী দলের (bands of immigrants) নেতা ছিলেন রাজকুমার বিজয়সিংহ। ইতিবৃত্ত দুইটিতে তাঁহাকে 'লাল'দেশীয় এবং বঙ্গদেশের এক রাজকুমারীর প্রপৌত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অনেকের মতে এই 'লাল'দেশ বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চল বা পশ্চিমবঙ্গ হইতে অভিন্ন। অতএব বিজয়সিংহ বাঙালী ছিলেন, এরূপ প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু আবার কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিকের মতে 'লাল'দেশ বলিতে লাট বা গুজরাট বুঝায়।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৩৪ ৯ মাহিন্দো আর সংঘমিত্তাঃ সম্রাট অশোকের পুত্র ও কন্যা। ইঁহারা ভিক্ষু ভিক্ষুণী হইয়া বৌদ্ধধর্মপ্রচারে ব্রতী হন।

৪০ ৬ এ এডেন বড় প্রাচীন স্থান...ঃ
অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-সংক্রান্ত যোগাযোগ-বিষয়ে এডেন কেন্দ্রীয় স্থান অধিকাব করিয়াছিল। 'Eryplus of the Erythraean Sea' নামক প্রাচীন প্রসঙ্গে এই নগরীর উল্লেখ আছে।

৪০ ৯ তাতে রোমী সুলতান...ঃ
ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রোমের সম্রাট প্রথম জাষ্টিনিয়ান (Justinian I) হাবসিরাজ কালেবকে (Caleb or El-Eshaba) খ্রীষ্টানদের উপর আরবদের অত্যাচারেব প্রতিশোধ লইতে অনুরোধ করেন। আনুমানিক ৫২৫ খ্রীঃ কালের সসৈন্যে লোহিতসাগর পার হইয়া আরব উপকূলে উপনীত হন এবং সমগ্র ইয়েমেন (Yemen) দেশটি অধিকার করেন। প্রায ৫০ বৎসর এই ভূ-ভাগ হাবসিদের অধীন ছিল। হাবসিগণ আরবকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের বাণিজ্য সিংহল এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত করে এবং সেই সঙ্গে পূর্বরোমক সাম্রাজ্যের সহিতও তাহাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সময় আরবের বিশেষ সমৃদ্ধি হয়।

৪১ ৬ কিন্তু হাবসি বাদশা মেনেলিকঃ
১৮৯৬ খ্রীঃ ১ মার্চ তারিখে আডুয়া বা আডোয়ার (Adua or Adowa) সন্নিহিত আব্বা গরিমা (Abba Garima) নামক স্থানে হাবসি সম্রাট (হাবসি ভাষায় Negus) দ্বিতীয় মেনেলিকেব সেনাবাহিনীর সহিত সংগ্রামে এক বিশাল ইতালীয় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়।

৪২ ২ ইহুদি নেতা মুসা...ঃ মোজেস্‌ বা Moses. O.T. Exodus, Ch. 14.

৪২ ২৫ নারীসিংহী মূর্তিঃ (Sphinx of Gizeh) আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৮০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত। ইহার দেহ সিংহের এবং মস্তক

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

মিশররাজ খাফ্রার (Khafra)। উক্ত রাজার সমাধির উপর নির্মিত পিরামিডের সম্মুখে স্থাপিত। অতি আধুনিককালে ইহার তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র।

৪৩ ৫ আইসিস্ ও হোরস্ঃ মিশরীয় পুরাণে আইসিস্ দেবতাদের রানী এবং ওসিরিসের ভগিনী ও পত্নী। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে গ্রীসেও আইসিসের পূজা প্রবর্তিত হয়। পরে রোমে এই দেবীর পূজা খুব প্রচলিত হয়। আইসিস্ চন্দ্রের প্রতীক, ওসিরিস্ সূর্যের প্রতীক। ইহাদের পুত্র হোরস্। আইসিস্ ও ওসিরিস্ নুইদেবীর কন্যা ও পুত্র।

৪৩ ১৫ টলেমি বাদশাঃ খ্রীঃ পূঃ ৩৩২ অব্দে আলেকজাণ্ডার মিশর অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় মেসিডনীয় সেনাপতি টলেমি বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে মিশর নিজ অংশে গ্রহণ করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়াতে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রথম টলেমি (Ptolemy) নাম গ্রহণ করিয়া মিশরের রাজা হন। বিশ্ববিখ্যাত ক্লিওপেট্রা (Cleopatra) এই বংশের শেষ উত্তরাধিকারিণী।

৪৩ ৯ ধর্মাশোকঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র অশোক পরিণত বয়সে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বহু সৎকাজ করায় এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আপ্রাণ সাহায্য করায় তাঁহাকে পরে ধর্মাশোক নামে ডাকা হইত।

৪৩ ১৭ (থেরাপিউট, স্থবির পুত্র), অসসিনি (ঈশানী), মানিকি (?)ঃ মিশর ও এশিয়া মাইনরে বৌদ্ধভাবে প্রভাবিত বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের নাম। দ্রষ্টব্য—The Master as I saw Him—Nivedita, P 273. এইগুলি হইতেই খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভবঃ বর্তমান ঐতিহাসিকগণের মতে খ্রীষ্টধর্ম থেরাপুটি, আসিনি প্রভৃতি বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতেই উদ্ভূত।

৪৩ ২২ পুস্তকালয় ভস্মরাশি হলঃ

আলেকজান্দ্রিয়ার সেরাপিয়াম (Serapeum) নামক অট্টালিকার সুবৃহৎ পুস্তকাগার খ্রীষ্টানরা ধ্বংস করে। ফলে ইহার অমূল্য পুস্তকরাজি অগ্নিদগ্ধ, বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট হয়। ৩৮৯ খ্রীঃ আরবগণ

পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

মিশর বিজয়কালে আলেকজান্দ্রিয়ার বিরাট রাষ্ট্রীয় পুস্তকাগারের ৭ লক্ষেরও অধিক পুস্তক ধ্বংস করে বলিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ-প্রচারিত অপবাদ যে একেবারে ভিত্তিহীন, এ-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। পুস্তকাগারটি খ্রীঃ পূঃ ৪৮ জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar) কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া আবরোধকালে অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়াছিল। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা খ্রীষ্টানগণ ধ্বংস করে।

৪৩ ২৩ বিদুষী নারী...ঃ হাইপেশিয়া নাম্নী এই নারী আলেকজান্দ্রিয়া শহরে সম্ভবতঃ ৩৭০ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। হাইপেশিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় অধ্যাপনা করিতেন এবং বেদান্তের সমগোত্রীয় নব্য-প্লেটোবাদীয় দর্শনের (Neo-Platonism) সমর্থকদের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন। তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি ওজস্বিতা শালীনতা ও সৌন্দর্যে বহু ছাত্র আকৃষ্ট হন।

রোমসম্রাট কনস্টান্টাইন কর্তৃক আইনতঃ স্বীকৃতিলাভের অনতিকালের মধ্যেই খ্রীষ্টান ধর্মের নেতৃগণ প্রাচীন দর্শন ও ধর্মনীতিগুলির সমূল উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হন। সাইরিল (Cyril) আলোকজান্দ্রিয়ার প্রধান যাজকের (Patriarch) পদ লাভ করেন এবং হাইপেশিয়া তাঁহার প্ররোচিত ধ্বংসযজ্ঞে আহুতি-স্বরূপা হন (মার্চ, ৪১৫ খ্রীঃ)। যেরূপ বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার সহিত এক ক্ষিপ্ত খ্রীষ্টান জনতা হাইপেশিয়াকে হত্যা করে, ধর্মান্ধতাজনিত পাপ ও অনাচারের ইতিহাসেও তাহার উদাহরণ বিরল।

৫৩ ১৯ এ সুয়েজ খালও অতি প্রাচীন জিনিসঃ প্রাচীন মিশরের ফারাও রাজাদের সময় একটি খাল কাটা হয়। মিশর রোমের অধীনে থাকাকালেও খালটি ব্যবহারোপযোগী রাখার চেষ্টা করা হইত। হারুন অল রসিদের রাজত্বকালেও এই খাল খনন করিবার পরিকল্পনা করা হয়। ১৮৫৮ খ্রীঃ তৃতীয় নেপলিয়র রাজত্বকালেও মিশরের সৈয়দ পাশার অনুমতি ও সাহায্য লইয়া ফার্দিন্যান্দ দ্য লেসেপস নামক এক ফরাসী ইঞ্জিনিয়র বর্তমান খালটি কাটেন।

১০ বৎসরের চেষ্টায় বহু অর্থব্যয়ে ১৮৬৯ খ্রীঃ এই খাল জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। মিশরের খেদিভ ইসমাইল (সৈয়দ পাশার পুত্র) ও ফরাসীরা এই খালের যুক্ত মালিক ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ হইতে খেদিভের সব অংশ ইংরেজ সরকার ক্রয় করে। ইংরেজরা বেশি অংশের মালিক কিন্তু কর্তৃত্ব ফরাসীর হাতে। গ্রীকদের লেখায় জানা যায় খ্রীঃ পূঃ ১৩০০ অব্দেও ঐ স্থানে একটি খাল ছিল এবং সেই প্রাচীন খালেরই গতিপথে বর্তমান খাল কাটা হইয়াছে। মিশর সরকার নাসেরের (General Nasser) নেতৃত্বে খালের তত্ত্বাবধান স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

৫৫ ২২ মুসলমান নেতা ওসমান: তুর্ক সুলতান ২য় মহম্মদের রাজত্বকালে ১৪৫৩ খ্রীঃ কনস্তান্তিনোপল তুর্কীরা দখল করে। সেই যুদ্ধের নেতা ওসমান তুর্কী ছিলেন।

৫৮ ১১ বর্নফ (E. Burnouf): প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ফরাসী মনীষী (১৮০১-৫২)। ১৮৩২ খ্রীঃ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বিশ বৎসর তিনি কলেজ অব্ ফ্রান্সে (College de France) সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'জেন্দ আবেস্তা' সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী পাশ্চাত্য জগতে সমাদর লাভ করে। ১৮৪০ খ্রীঃ ভাগবত-পুরাণের অনুবাদ এবং ১৮৪৪ খ্রীঃ বৌদ্ধধর্মে ইতিহাস (Historie de Buddhisma) প্রকাশ করেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

৫৮ ১২ মাসপোরো: দ্রষ্টব্য ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৬।

৫৮ ১৪ কুনা (Kuenen): এব্রাহাম কুনা (১৮২৮-৯১) হল্যাণ্ডের হারলেমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত বাইবেল সমালোচক। ১৮৫৩ খ্রীঃ লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মবিষয়ের অধ্যাপকপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'Historico—Critical Inquiry into the Origin and Collection of the Books of the Old Covenant (১৮৬১-৬৫)।

৬১ ৫ ("রোজেট্টা স্টোন'...একজন পণ্ডিত":)

নেপোলিয়নের মিশর অভিযানকালে এই প্রস্তরখণ্ড বোসার্ড

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

(Boussard) নামক একজন ফবাসী সামরিক কর্মচাবী আবিষ্কার করেন। রোজেট্টা-নামক নগবে ইহা পাওয়া যায় বলিযা ইহাব এই নামকবণ হয়। বিখ্যাত ফবাসী পণ্ডিত চ্যাম্পোলিয়ন (Champollion) এই প্রস্তর-লিপিব পাঠোদ্ধাব কবেন এবং ইহার সূত্র অনুসরণ কবিয়া প্রাচীন মিশবীযগণেব সকল শিলালিপিব পাঠোদ্ধারের সূত্র আবিষ্কৃত হয। প্রস্তবখণ্ডটি এখন ব্রিটিশ মিউজিযমে সংবক্ষিত।

৬৩ ২০ ইহুদীবা ইস্রেল আর ইফ্রেম দুই শাখায় বিভক্ত হলঃ সলোমনেব মৃত্যুর পর ইহুদীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয। উত্তরে ইস্রেল এবং দক্ষিণে জুডা। খ্রীঃ পূঃ ৯৩৫ হইতে ৭২৫ পর্যন্ত এই দুই বাজ্য বর্তমান ছিল। ইস্রেলের নেতা জেরোবোয়াম এবং জুডাব নেতা বেহোবোযাম। উভয় রাজ্যই ইহুদী এবং উভয নেতাই সলোমনেব পুত্র। তথাপি দুই বাজ্যে মিল ছিল না।

৬৪ ১৩ 'জোসিফুস আর ফিলো'ঃ ফিলো আলেকজান্দ্রিয়ার একজন ইহুদী লেখক (৪০ খ্রীঃ)। তাঁহাকে ইহুদী প্লেটো বলা হইত। জোসিফুস্ ফ্লেভিযাস (৩৭-৯৫ খ্রীঃ) ঐতিহাসিক ও যোদ্ধা। ইহুদীদের প্রথমাবধি আরম্ভ কবিয়া ৬৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বোমেব সহিত যুদ্ধবৃত্তান্ত লেখক। তাঁহার লিখিত ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ 'The Jewish Antiquities.'

৬৯ ২৩ ভিক্তর হ্যুগোঃ (Victor Hugo, ১৮০২-৯৫) বিখ্যাত ফবাসী কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার।

ঐ ঐ লা মার্টিনঃ অ্যালফ্যান্সো মেরি লুই ডি লা মার্টিন (১৭৯০-১৮৬৯) ফরাসী কবি, ঐতিহাসিক ও রাজনীতিজ্ঞ।

ঐ ঐ গ্যেটেঃ (Goethe, ১৭৪৯-১৮৩২) সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান কবি। 'ফস্ট' ইহারই অমর কাব্য।

৬৯ ২৩ শিলার (Schiller, ১৭৫৯-১৮০৫) বিখ্যাত জার্মান কবি ও নাট্যকার। গ্যেটের পরেই ইহাঁর স্থান।

৬৯ ২৮ হার্বার্ট স্পেন্সারঃ দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৭।

পৃষ্ঠা পঙক্তি

৭০ ২৪ মার্টিন লুথারঃ (১৪৮৩-১৫৪৬) জার্মান ধর্মসংস্কারক। ইনিই প্রটেস্টান্ট ধর্মের প্রবর্তক। (দ্রঃ চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬)।

৭২ ১৩ কংফুছেঃ দ্রষ্টব্য নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৫ ও তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৯।

৭৫ ২১ চীনক্ষেত্র...স্বীকার করেছেনঃ বক্সার অভ্যুদয়ের সময় (১৯০০ খ্রীঃ) ইউরোপীয় জাতিগুলি জার্মানির নেতৃত্বে চীন আক্রমণ করিয়া পিকিং পর্যন্ত দখল করে এবং অবাধ লুঠতরাজ করিয়া বহু নরনারীকে হত্যা করে।

৭৮ ৬ অস্ট্রিয়ার বাদশা...ঃ

১২৭৩ খ্রীঃ রুডল্‌ফ্ (Count of Hapsburg) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের (Holy Roman Empire) সম্রাট নির্বাচিত হন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি অস্ট্রিয়া রাষ্ট্র (Archduke) জয় করেন। এই সময় হইতে পাঁচ শতাব্দীরও কিছু অধিক সময় হ্যাপসবার্গ (Hapsburg) বংশীয় অস্ট্রিয়ার শাসকগণ (Archduke) বংশানুক্রমে এই সাম্রাজ্যের সম্রাটপদে নির্বাচিত হইতে থাকেন। ১৮০৬ খ্রীঃ ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বার বার অস্ট্রিয়গণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং কার্যতঃ সমগ্র জার্মানি নিজের পদানত করিয়া ঘোষণা করেন যে, তিনি ‘পবিত্র রোমান সম্রাট’ এই উপাধি অগ্রাহ্য করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তৎকালীন ‘পবিত্র রোমান সম্রাট’ দ্বিতীয় ফ্রান্‌সিস (Francis II) এই উপাধি পরিহার করিয়া নিজেকে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারী সম্রাট প্রথম ফ্রান্‌সিস (Francis I, Hereditary Emperor of Austria) বলিয়া ঘোষিত করেন।

প্রুশরাজ মহান ফ্রেডেরিকের (Frederick the Great) সময় হইতে (১৭৪০-৮৬ খ্রীঃ) প্রুশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দুইটি রাষ্ট্রের জীবন-মরণের সমস্যারূপে দেখা দেয়। জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য ক্রমশঃ অস্তমিত হইতে থাকে এবং প্রুশিয়ার শক্তি ও গৌরব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৬৬ খ্রীঃ অস্ট্রিয়া প্রুশিয়া কর্তৃক ‘সপ্ত সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধে’ (Seven Weeks’

পৃষ্ঠা পঙক্তি

War) পরাজিত হয়, এবং ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রুশ প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের অপূর্ব বুদ্ধিকৌশলে এক পরাক্রমশালী জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় (১৮৭১ খ্রীঃ)।

৭৮ ২৪ ইতালির রাজা আর রোমের পোপে মুখ দেখাদেখি নাই : ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে এবং বিশেষ করিয়া ইতালিতে নেপোলিয়ন কর্তৃক একটি ক্ষণস্থায়ী ইতালীয় রাজ্যগঠনের ফলে ইতালীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরিত হয়। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এক বিরাট আন্দোলনের (The risorgimento) কেন্দ্রস্থল পীয়েডমন্টের রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সশস্ত্র সাহায্য দান করেন। ফলে পোপের রাজ্য ব্যতীত ইতালীর সকল রাজ্য পীয়েডমন্টের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং ভিক্টর ইম্যানুয়েল নবসৃষ্ট ইতালীয় রাজ্যের অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হন। তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজের সিংহাসনের স্তম্ভরূপ তাঁহাব রোমান ক্যাথলিক প্রজাগণের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রোমে একদল ফরাসী সেনাবাহিনী সংস্থাপিত করিয়া পোপের রাজ্য রক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় এবং ইহার ফলে তাঁহার সিংহাসনচ্যুতি ঘটিলে ভিক্টর ইম্যানুয়েল সসৈন্যে রোম অধিকার করিয়া এই ইতিহাসপ্রথিত নগরীকে স্বাধীন ইতালি রাজ্যের রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করেন (১৮৭১ খ্রীঃ)। এইরূপে পোপের রাষ্ট্রের (temporal power) অবসান হয়। ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইতালীয় গভর্নমেন্ট পোপকে বার্ষিক মোটা টাকার বৃত্তি, Vatican ও Lateran-প্রাসাদদ্বয়ে তাঁহার স্বাধীনভাবে বসবাসের সুবিধা, ধর্মসম্পর্কীয় ব্যাপারে যাবতীয় ক্ষমতার অক্ষুণ্ণতা ইত্যাদি প্রস্তাব করিয়া একটি আইন পাস করেন (The Law of Guarantees), কিন্তু পোপ এ সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজেকে ইতালীয় সরকারের বন্দী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং রোমান ক্যাথলিক রাষ্ট্রগুলিকে তাঁহার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

করিয়া দিতে আহ্বান করেন। ইহা লইয়াই ইতালীয়রাজ এবং পোপের মধ্যে বিশেষ শত্রুতা শুরু হয়, এবং তাঁহাদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়।

৭৯ ২২ নব্য ইতালির অভ্যুত্থান...নবজীবনের অপব্যবহারেঃ সহস্রাধিক বৎসর বহুধাখণ্ডিত, বহিঃশত্রুর আক্রমণে জর্জরিত, বৈদেশিক শক্তিগণের পদানত থাকিবার পব ঊনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগে ইতালীয়গণ যে স্বাধীনতা লাভ করিল, তাহারা তাহার সদব্যবহার একেবারেই করিতে পারিল না। কাভুরের অকালমৃত্যুর পব দেশের শাসনক্ষমতা যে-সকল নেতার হস্তে পড়িল, তাঁহাবা দারিদ্র্যপীড়িত দেশবাসীর মঙ্গলসাধনে ব্যাপৃত না হইয়া ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থসংরক্ষণে অধিকতর মনোনিবেশ করেন। দেশবাসীর দৃষ্টি তাঁহাদের দুর্নীতি এবং দেশের দুরবস্থা হইতে অন্যত্র সরাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিদেশে ইতালীয় সাম্রাজ্যস্থাপনের সঙ্কল্প করেন। নানা কারণে উত্তর আফ্রিকার দুর্বল রাজ্যগুলির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। এককালে রোমক সাম্রাজ্য আফ্রিকায় বিস্তৃত ছিল—এজন্য এই ব্যাপারে ইতালির জনসাধারণের সায পাওয়া গেল। ফ্রান্সের সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হইল, কারণ ফ্রান্সও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছিল। এই সময় ইংলণ্ড মিশরে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করে এবং ফ্রান্সের সঙ্গে কলহ করিয়া মিশরীয় সুদানের (The Sudan) দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল; কিন্তু সুদানে এই সময়ে 'মেহেদী' (The Mahdi= প্রেরিত পুরুষ) অভিহিত এক শক্তিশালী পুরুষের অবির্ভাব হওয়ায় কোন সুবিধা হয় নাই। এ-কারণে ইংলণ্ড বন্ধুত্বের ছল করিয়া ইতালিকে আফ্রিকায় অগ্রসর হইতে প্ররোচিত করিল। নির্বুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি-প্রণোদিত ইতালীয় সরকার সহজেই ইংলণ্ড প্রমুখ মহান্ শক্তিগুলির (Great Powers) রচিত ফাঁদে পা দিল। প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্‌পি (Crispi) 'জবরদস্ত আদমী' (Strong Man) বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং নিজের ক্ষমতা বজায়

রাখিতে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় মনে করিতেন, তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত ইংলণ্ড ইঙ্গিত দিল—সুদানসন্নিহিত ইথিওপিয়া, আবিসিনিয়া বা হাবসি রাজ্য আক্রমণ করিতে। ইতালীয়গণ প্রথমে কিছু সাফল্য লাভ করিল। তারপব আসিল হাবসিরাজ মেনেলিকের হস্তে আদোয়াব যুদ্ধে ভীষণ পরাজয় (ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫)। তাহাদের সেনাবাহিনীর ১৪,০০০ সৈনিকের মধ্যে ৭,৬০০ হতাহত, প্রায় ৩,০০০ বন্দীকৃত, একজন সেনাধ্যক্ষ বন্দীকৃত, দুইজন নিহত এবং একজন আহত হয়। কৃষ্ণকায়গণের হস্তে শ্বেতাঙ্গদের এত বড় পরাজয় ইতিহাসে বড় একটা হয় নাই। পৃথিবীতে এবং বিশেষ করিয়া শ্বেতাঙ্গদের কবলিত ভারতবর্ষ প্রমুখ দেশগুলিতে এই ঘটনাব প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইল। ক্রিস্‌পি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত প্রধানমন্ত্রী রুডিনি (Rudini) অগত্যা মেনেলিকের সহিত সন্ধি কবিলেন। ক্ষতিপূরণস্বরূপ একটা মোটা রকমের অর্থদণ্ড দিতে হইল, এবং আবিসিনিয়া হইতে পিছু হটিয়া আসিতে হইল।

২ লেগলঁ (L'aigon=The Eagle)ঃ প্রথম নেপোলিয়ন ১৮১০ খ্রীঃ অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যা মেরী লুইসীকে (১৭৯১-১৮৪৭) বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে জাত পুত্রটিকে জন্মমাত্র (১৮১১ খ্রীঃ) ইতালির রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নেপোলিয়নের পতনের পর মাতামহ অষ্ট্রিয়ার রাজার সানব্রান প্রাসাদে নজরবন্দী জীবনযাপন করিয়া এই পুত্র ১৮৩২ খ্রীঃ অকালে দেহত্যাগ করে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল ড্যুক অব রাইখস্টাড। ফরাসীরা পূর্বগৌরব স্মরণ করিয়া গরুড়শাবক (লেগলঁ) নামকরণ করিয়াছিল।

৬ চাণক্য মেটারনিকঃ চাণক্য বা কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের গুরু এবং সর্বজনবিদিত অর্থনীতি ও রাজনীতিবিদ্। অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী

মেটারনিক (১৭৭৩-১৮৫৯) কূটনীতিবিশারদ ছিলেন। চা
সহিত তাঁহার তুলনা করা হইয়াছে।

৯২ ২৬ এলুসি-রহস্য ঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে গ্রীসে এই গুপ্ত
প্রচলিত ছিল। এই অনুষ্ঠানে দেবী ডেমিটার ও তাঁহার কন
পারসিফোনকে (Persephone শস্য, চাষ ও উর্বরতার দে
তুষ্ট করা হইত। খ্রীঃ পূঃ ৪০০ অব্দে এথেন্সে ইহা সরকারী
পরিণত করা হয়। হেমন্তকালের প্রথমেই ৮।৯ দিন উৎসব হই
১০০ খ্রীঃ-এর পরে রোমেও ইহা প্রচলিত হয়।

ঐ ২৮ Olympian Games ঃ বর্তমানে অলিম্পিক ক্রীড়া
প্রতি ৪ বৎসর অন্তর বিভিন্ন দেশে সংঘটিত হইতেছে
১৮৯৬ খ্রীঃ প্রথম এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, তবুও
এলিসের অলিম্পিয়া উপত্যকায় অতি প্রাচীনকাল হইতে
চতুর্থ বৎসর জুলাই মাসে জিউস দেবতার উদ্দেশ্যে
ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত। হারকিউলিস এই
আরম্ভ করেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ক্রীড়ায় জয়লাভ
বিজয়িগণকে কবিদের রচিত সঙ্গীত দ্বারা বন্দনা করা হইত
হারকিউলিস-রোপিত অলিভ বৃক্ষের পত্র দ্বারা
শোভিত করা হইত। এই ক্রীড়া ৪০০ খ্রীঃ বন্ধ হইয়া যায়।
পূঃ ৭৭৬ অব্দের বহু পরে লিখিত এই ক্রীড়ার একটি
পাওয়া যায়, সুতরাং ঐ বৎসরকে মান ধরিয়া গণনা
৪ বৎসর অন্তর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে।
ক্রীড়া প্রায় সহস্রাধিক বৎসর কাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।
পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ